পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

২য় স্মারক বক্তৃতা—২০১০

বৌদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ডঃ আশা দাশ

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি

ও

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
২য় স্মারক বক্তৃতা—২০১০

বৌদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ডঃ আশা দাশ

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

বৌদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান
ডঃ আশা দাশ

স্বত্বাধিকারী : প্রকাশ সংস্থা

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১০

প্রকাশক : সুজিত কুমার বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
৫০টি/১এ পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কোলকাতা - ৭০০ ০১৫

মুদ্রক : নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১ ঝামা পুকুর লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ২০ টাকা

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মরণে

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন বিংশ শতকে ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন বরেণ্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। বিদ্যায়-পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে-গরিমায়, ত্যাগে-তিতিক্ষায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মহাপুরুষ। তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধবচন অধ্যয়ন করে তিনি পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং স্বদেশে ফিরে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে ত্রিপিটক বিশারদ উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর মহামুনি পালি বিদ্যালয়, নালন্দা বিদ্যাভবন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। জৈন, বেদান্ত ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে সংগীতিকাররূপে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মাধার মহাস্থবিরের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধ হয় তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলিতে এবং নালন্দা পত্রিকার সম্পাদনায়। কথিত হয়েছে সরস সাবলীল বাংলা ভাষায় মিলিন্দ প্রশ্নের মূলানুগ অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। বাংলার সমসাময়িক বিদুষী মনীষীরা তাঁর অনুবাদিত ও স্বকীয় রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মিলেছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত ডঃ বি. সি. লাহা স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে।

ভিক্ষুসংঘের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সংঘরাজ এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন সদগুণের সমাবেশে ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন পরমারাধ্য ধর্মগুরু।

তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে অমর রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি যার উদ্যোগে প্রতি বৎসর পালিত হয় ধর্মাধার জয়ন্তী উৎসব। পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ যথাশীঘ্র সমাপ্ত করে শিক্ষা ও নানাবিধ কল্যাণকর্মে লিপ্ত থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল প্রথম সংঘরাজের শেষ আশ্রয়স্থল এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র। নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সাল থেকে স্মারক বক্তৃতার প্রচলন করা হয়েছে। প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেছেন অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক। এ বৎসরের বক্তা অধ্যাপিকা ডঃ আশা দাশ। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও লিখিত ভাষণ প্রদানের জন্য সম্মত হওয়াতে আমরা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া
সভাপতি
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

কোলকাতা
২৭শে জুলাই, ২০১০

ডক্টর আশা দাশ সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ডক্টর আশা দাশ সাহিত্য জগতে একজন কীর্তিমান মহিয়সী। বহুল আলোচিত সংগ্রামী জীবন দর্শনে তিনি একজন বিজয়ী সৈনিক এবং সাহিত্য সাধনায় একজন সফল লেখিকা। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা।

ডক্টর আশা দাশের জন্ম হয় ১৯২৯ সালের ২রা এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা পাঠালকোটা গ্রামে। পিতা মহেন্দ্র দাশ ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী। আশা দাশ ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৪৫ সালে চলে আসেন মেদিনীপুরের বলরামপুরে বাংলাদেশের প্রথম বেসিক ট্রেনিং স্কুলে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী দাঙ্গার সময় গান্ধীজীর ডাকে আর্তত্রাণের দায় নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি প্রাইভেট আই. এ. পাশ করার পর ১৯৫৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে এম. এ. এবং পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পি. এইচ. ডি. করার পর বেশ কিছুদিন বিনা পারিশ্রমিকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম হিসেবে পড়ান। পালি বিভাগের প্রধান ড. অনুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হওয়ার পরে কর্পোরেশনের চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। অধ্যাপনা থেকে অবসরের পর বর্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রকার গবেষণা ও লেখা-লেখি কাজে লিপ্ত আছেন।

অধ্যাপিকা দাশ একজন পণ্ডিত, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি পালি সাহিত্যে তাঁর অবদান ব্যাপক। বিশেষ করে পালি ভাষা ও সাহিত্যকে নন্দনতত্ত্বের নিরীখে বিচার করার ব্যাপারে বৌদ্ধ জগতে আশা দাশ অন্যতম পথ প্রদর্শক। এ যাবৎ তিনি প্রায় ৩২টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লিখিত দেড় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থসমূহ প্রবন্ধের বিষয় বস্তু গবেষণালব্ধ ও ব্যাপক। প্রবন্ধ পাঠের জন্য স্বদেশে ও বিদেশের বহু সেমিনারে এবং কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেছেন। তিনি অগণিত গবেষক ও অধ্যাপককে বহু বিচিত্র আবিষ্কারের পথে চালিত করে স্মরণীয় ও নন্দনীয় হন।

তিনি কলিকাতা ভাষা শিক্ষা ও পর্যেষনা পর্ষৎ এর Director, বুদ্ধগয়া International Meditation Centre এর Vice-president, Mahabodhi Society of Indiaর Governing Body-র member হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর রচিত 'বৌদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Griffith Memorial Prize দ্বারা সম্মানিত হন। এছাড়াও বুদ্ধিষ্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার (বাংলাদেশ) তাঁকে 'বিদ্যাবর্তিতা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আমরা অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব বেঙ্গলী বুদ্ধিষ্টস্ এবং ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

বৌদ্ধ-চেতনায় ঋদ্ধ ধর্মাধার মহাস্থবির :

ভারতের হিমালয় আর ভারতের বুদ্ধ দুই-ই আমাদের মনে অপার বিস্ময়ের সঞ্চার করে। অভ্রভেদী হিমালয়ের পরম গাম্ভীর্য ও বিপুল বিস্মৃতির এক বিশেষ আকর্ষণও আছে। সমগ্র বিশ্বে ঠিক একই প্রকার আকর্ষণীয় ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজকুমার সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ কঠোর কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করে নিরঞ্জনা নদী-তীরে বোধিবৃক্ষ মূলে ধ্যান সমাহিত হন। তাঁর কাছে মার পরাজিত হল। শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থ মারজয়ী বুদ্ধ হলেন। যিনি ছিলেন রাজার পুত্র, রাজ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, তিনি এবার নিত্যকালের রাজপথের চির পথিক হলেন। এই নিত্যকালের চিরপথিকের কণ্ঠে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও আচারপরায়ণতার (ritual) বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় জাগরণ ঘটল। মিথিলার রাজর্ষি জনকের আবির্ভাবে এর সূচনা। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্য একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একটা উচ্চতর দর্শন যা বৈদিক ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র, যা অরণ্যকুঠিরে উচ্চারিত কালক্রমে তা মহান ক্ষত্রিয় ধর্ম প্রচারকের (Preacher) আবির্ভাব ত্বরান্বিত করেছিল। এইভাবে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারায় একটা নূতন শক্তির উদ্ভাবন ঘটে। বুদ্ধ হলেন এই নবযুগের স্রষ্টা। নব-নির্মাতা।

প্রশ্ন আসে বুদ্ধ এই নবযুগকে কী দিয়েছেন? ঐতিহাসিকেরা তার জবাব দিয়েছেন।

১। বুদ্ধ ভারতকে দিয়েছেন একটা জনপ্রিয় ধর্ম (Popular religion)। এই ধর্ম জটিল বা দুর্বোধ্য নয়। আচারগতও নয়। তিনি ধীর ও সদা সতর্কভাবে জনগণের কাছে আবেদন রেখেছেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ধর্মের সহজ সারল্য ও ভাবাবেগ, নৈতিক নিয়মাবলী (code), মাতৃভাষায় শাস্ত্র প্রণয়ন, গল্প ও কাহিনী মাধ্যমে জনপ্রিয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, সমাবেশের মাধ্যমে (congregation) ধর্ম প্রচার সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করেছে। বক্তব্যের গভীরতায় এবং উপস্থাপনা ও আঙ্গিক প্রকরণেও তিনি একক ও অনন্য। প্রকৃতির শক্তি যা বৈদিক আর্যগণের প্রার্থনায় অনুরণিত এবং উপনিষদের আবেগহীন, অব্যক্ত, অচল, অচিন্ত্য ব্রহ্মের জায়গায় বুদ্ধ একটা ব্যক্তিগত আবেদন রেখেছেন। এ আবেদন ধ্যানানিষ্ঠ মহামানবের শুভ্র-শুদ্ধ মহাজীবনের মহাবিস্তারের মঙ্গল সমাচার।

২। মূর্তি পূজা বা Image worship ভারতবর্ষে বুদ্ধ অনুগামীদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছে। আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীনতম বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের স্মারক বা commemorative রূপে। বুদ্ধ শাস্তা (Teacher) ধর্মোপদেষ্টা (Preacher) রূপে শিষ্যদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। কিছুকাল পরেই মহামানব বুদ্ধ পরিণত হয়েছেন দেবতা বা godhead রূপে। বুদ্ধের পবিত্র মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। মন্দির নির্মিত হয়েছে। যখন বৈদিক আর্যগণ যজ্ঞ করছেন উন্মুক্ত স্থানে (ঠিক

এইরকম ব্যবস্থাই ছিল Persiaতে) তখন বুদ্ধ শিষ্যেরা সর্বজনীন তীর্থ গড়ে তুলতে পেরেছেন।

(৩) বুদ্ধের ধর্ম monastic systemর উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদিন ছিল অরণ্যে নিঃসঙ্গ ভাবে বাসকারী উপাসক সম্প্রদায়। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিত্বগণ তাঁদের শেষ জীবনে শান্তির জন্য অরণ্যে একাকী বাস করতেন। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুরা ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করে শাস্ত্রের প্রদত্ত অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতে লাগলেন। ব্যক্তি পরিচালনার পরিবর্তে এসে পড়ে monastic system of life-এর যৌথ আবেদন।

(৪) বৌদ্ধধর্ম একটা বিপুল সাহিত্য কথ্য ভাষায় গড়ে তোলে যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য। বুদ্ধ জানতেন তাঁর বাণী কোন ভাষায় কীভাবে, কার কাছে, কেমন করে পরিবেশন করতে হবে। একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক হিসাবে এখানে তার কলাসিদ্ধি অনন্য। পুরোহিত তন্ত্রের পবিত্র ভাষার সিংহ তোরণে উপনীত হবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। বুদ্ধ সাধারণের ভাষার স্বীকৃতি দিলেন। নব জাগরণের অনন্য রূপকার হিসাবে এ তাঁর একক কৃত্য।

(৫) ভারতীয় জীবনে বুদ্ধের সর্বাপেক্ষা মনোরম দান হল শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। এখানে নূতন-নূতন আদর্শ, চিন্তাধারা, প্রতীকী অভিধা সংযুক্ত হয় যা বৈদিক আর্যগণ চিন্তাও করেননি। বৌদ্ধদের দ্বারা প্রবর্তিত এই ভাব ও ভাবনা পরবর্তী হিন্দু যুগ বা Later Hindu Period পর্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা গুহা, চৈত্য, মন্দির ইত্যাদির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয়কে পরিস্ফুট করেন। পরবর্তীকালে হিন্দু ও জৈনরা তা অনুসরণ করেন।

(৬) বুদ্ধের ধর্ম ভারত ও বৈদেশিক রাজ্যের মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করে। এই ধর্ম বহির্বিশ্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। ইহা একটি Universal movement, বিশ্বজনীন আন্দোলন। দেশ ও জাতি নিরপেক্ষ একটা শক্তি। বুদ্ধের বাণী—

'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়,
লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং।'

এই বাণীর প্রেক্ষিতে বুদ্ধ শিষ্যেরা তাঁর ধর্মকে আনন্দে, আবেগে ভালবাসায় দেশদেশান্তরে বয়ে নিয়ে গেছেন। ইহা একটি সর্বব্যাপী শক্তি বা force যা প্রায় সমগ্র প্রাচ্য গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় ভিক্ষু ও পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম বিদেশে বহন করে নিয়ে যান। তারপর থেকে এই সমস্ত দেশের জনগণ ভারতকে পবিত্র ভূমি রূপে দেখতে থাকে। ভারত তাদের ধর্ম বিশ্বাসের স্থান বা Cradle of faith.। ভারত-তীর্থ ভ্রমণ পবিত্র ও পুণ্য কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয়।

অমৃতের সন্ধানেই মানব সভ্যতার যা কিছু প্রচেষ্টা তপস্যা ও কর্ম। ভগবান বুদ্ধের বাণী—

'অপারুতা তেসং অমতস্স দ্বারা
যো সোতবন্তো পমুচ্চন্তু সদ্ধং।'
বিশ্ববৃত্ত পরিক্রমা করেছে এ মহাবাণী
শ্রদ্ধায়, আনন্দে, প্রণিপাতে, গৌরবে
যাঁরা স্রোতবান তাঁরা পেয়েছেন
পূর্ণায়তির আশ্বাস।
উধ্বায়ত চেতনায় তাঁরা সমুত্তীর্ণ।
হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী।

তারপর—

এসেছে নিরন্ধ্র তমসা, নিরবচ্ছিন্ন অবনতি
অবক্ষয়ের অন্ধ সম্মোহ।
ফিনিক্স পক্ষীর মত সেই চিতাভস্ম থেকে
উঠে এলেন একজন, আরো একজন,
আরো—আরো অনেকে।
এঁরা অমল মুক্তি পথের পথিক।
শান্ত, স্থির, নির্বাণলোকের অভিসারী।
যাঁদের জীবন-বেদ—
'সব্ব পাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।'

এই 'অনেকে' হলেন— অগ্র মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির, ধর্মানন্দ মহাস্থবির, আর্যবংশ মহাস্থবির, গুণালঙ্কার মহাস্থবির, ধর্ম তিলক মহাস্থবির, শীলালঙ্কার মহাস্থবির, ভিক্ষু শীলানন্দ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মরত্ন মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ এবং ধর্মাধার মহাস্থবির।

নিরন্ধ্র তমসা নিরবচ্ছিন্ন অবনতির সম্পর্কে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জীবনীকার ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু লিখেছেন, "এমন একদিন ছিল যখন গোটা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, কেবল মাত্র ভারতবর্ষের একপ্রান্তে চট্টগ্রামে কিছু বৌদ্ধ তখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন, তাও নাম মাত্র। অর্থাৎ নামে বৌদ্ধহলেও আসলে ভগবান বুদ্ধের বাণীকে তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

মাত্র একশত বছর পূর্বেও তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের কোন চিহ্ন ছিল না। শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁরা ছিলেন অনগ্রসর। ধর্মগুরু যাঁরা ছিলেন তাঁরা অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় পুরোহিত বা 'রাউলী' নামে পরিচিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তমসাবৃত চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধদের উদ্ধারকর্তারূপে আকিয়াব থেকে এলেন মহামান্য সংঘরাজ রাজগুরু

পণ্ডিত শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবির। তিনি নূতন করে বুদ্ধের ধর্মবাণী চট্টগ্রামে প্রচার শুরু করলেন। তৎকালীন বাঙালী বৌদ্ধরা শিক্ষায় অনগ্রসর হলেও সারমেধ মহাস্থবিরের আহ্বানে তাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। বিশেষ করে বৌদ্ধ যুবকেরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তীকালে এরা নিজেদের কর্ম প্রতিভা দ্বারা জাগরণকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। ক্রমে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হন ঋষিকল্প মহাপুরুষগণ। এঁদের মহান ত্যাগ, তিতিক্ষা সহনশীলতা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞানগরিমা, আদর্শনিষ্ঠা, কল্যাণ প্রবণ মানসিকতা, শীলসমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন এবং মৈত্রী করুণা, অহিংসা ও আত্মসংযম গুণে এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম, এমন কি সাহিত্য ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও নব জাগরণের সূচনা হয়েছিল।" (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃ. ১-২)

তাঁদেরই একজন ধর্মের পূর্ণতায় অভিস্নাত
ধর্মাধার।

তাঁর জীবনীকার বলেন,

"তিনি বঙ্গমাতার সুসন্তান, ত্রিপিটক বিশারদ, স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত, ষষ্ঠসঙ্গীতিকারক, সুপণ্ডিত, সর্বদর্শনাচার্য, তত্ত্বভূষণ, বহুশ্রুত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ, পাহাড়তলী মহানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও বিহারাধ্যক্ষ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সেবা সদনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সঙ্ঘরাজ, ভূতপূর্ব রাজগুরু, বহু গ্রন্থ প্রণেতা।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২)

এ হল ধর্মাধারের মহান জীবন কৃত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

তাঁর মর্ত্যদেহ ধারণ—

১৯০১ সাল, ২৭শে জুলাই, সোমবার।

পিতা পণ্ডিত 'পুরচন্দ্র', মাতা কল্যাণী 'প্রাণেশ্বরী'।

জন্মস্থান সোনার বাংলার চট্টলা
সমুদ্র-শোভিতা নদী মেখলা
পাহাড়-প্রান্তরের অপরূপ রূপায়তি।
সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মায়ের
মহামহিম মূর্তি।
ধন্য জননী জন্মভূমি।

পিতৃমাতৃ প্রদত্ত নাম 'বিপিন চন্দ্র'। বৌদ্ধ অধ্যুষিত ধর্মপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম। শাস্ত্রে আছে—

'দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জায়তি,
যথা সো জায়তি ধীরো তৎ কুলং সুখমেধতি।'

১৯০৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি।

স্বাধ্যায়ে তপস্যায় অনুব্রত বালক।

১৯১৪ সাল।

বিনা মেঘে হল বজ্রাঘাত—
পিতার মৃত্যু।
তের বৎসরের কিশোর মৃত্যুকে দেখল
সামনে, অতি সন্নিকটে।
প্রত্যহের দুঃখ-শোক,
নিত্য হাহাকার, প্রেয় বস্তুর অন্তহীন অন্ধকার
চাই না, চাই না, এই মর্ত্যসুখের জীবন—
ভোগ্য বস্তুর সমাহার।
কিশোর বালক হলেন অমৃতের সন্ধানী।

শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর নূতন নাম হয় শ্রমণ বিপিনচন্দ্র। দীক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় ধর্মকথিক মহাস্থবির

১৯২২ সালের ১৬ই নবেম্বর। শাক্যমুনি বিহার।

প্রারব্ধের শেষ।
শ্রমণ বিপিনচন্দ্র হলেন ভিক্ষু ধর্মাধার।
সর্বজয়ী, পবিত্র পুণ্যনাম।
ভিক্ষুর প্রশান্ত মহিমা, সম্ভ্রম জাগানো ব্যক্তিত্ব।
ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।
একজন চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব।
যাঁর রয়েছে অন্যকে পরিচালিত করার শক্তি।
বোধে পরিব্যাপ্ত, বোধিতে সমুত্তীর্ণ
একজন অনন্য গুরু।
যিনি চেতনায়, চরিত্রে বিরাট
পূর্ণের প্রজ্ঞায় স্থিত।
নির্বাণের সাধনায় সমুত্থিত জ্ঞান-সূর্য।

এবার—

শুরু হল অম্লান ধর্মাভিসার।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী সিংহল যাত্রা করলেন। দ্বিতীয় বার সিংহলে উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। সিংহলে থাকতে তিনি বুঝেছিলেন বাঙালী বৌদ্ধদের সমাজে যত অন্ধকার, যত দুঃখ, যত ধর্মের কুসংস্কার তার মূলে শিক্ষার অভাব। তাঁর স্বভাব সুলভ সৌজন্য, বিনয় নম্র ভাব, মিত ভাষিতা এবং মধুর আলাপন তাঁকে সকলের কাছে একজন মহৎ ব্যক্তিরূপে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

পরিক্রমা চলে—

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে ব্রহ্মদেশ যাত্রা।

সপ্তস্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠে।

পরিক্রমা চলে—

আসাম, শিলং, চট্টগ্রামের সর্ব প্রান্তদেশ, দার্জিলিং, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, লুম্বিনী, নেপাল, ভূটান, দিল্লী, শ্যামদেশ, কম্বোডিয়া।

কত দেশ হতে দেশান্তরে।

বহুস্বরা জীবনের আলোকাভিসার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। চারিদিকে—

মহাসমরের মহাবিভীষিকা

নিষ্ঠুর, হৃদয় বিদারক, কালাগ্নি সদৃশ

ধ্বংস-মৃত্যু-মহামারীর হাহাকার।

ভিক্ষু ধর্মাধার এবার কেবল ধর্ম প্রচার আর তীর্থ ভ্রমণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলেন না। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে রিলিফ সেন্টার পরিচালনা করতে লাগলেন। ভিক্ষু ধর্মাধার হলেন সমাজ সেবক ধর্মাধার। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় মানুষের মধ্যে চাল, গম, ডাল, চিনি, দুধ, বস্ত্র ও অন্ন বিতরণ হতে লাগল।

১৯৩৭ সাল।

১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীটে ত্রিতল বিল্ডিং নির্মিত হয়। প্রভু দয়াল হিম্মত সিংকার সহায়তায় এবং শেঠ যুগল কিশোর বিড়লার বদান্যতায় ধর্মাঙ্কুর বিহার স্থাপত্যায়িত। বিল্ডিং এর নাম হয় 'আর্য বিহার'। ভিক্ষু ধর্মাধার কর্তালার ও ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ হলেন। একই সঙ্গে উভয় বিহার তিনি পরিচালনা করতেন। এ সময় Bengal Buddhist Association এর সম্পাদক ছিলেন ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া।

১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই।

নালন্দা বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭ সালে পণ্ডিত ধর্মাধার নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ

পদে বৃত্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে তিনি প্রায় ১০ বৎসর অধ্যাপনা করেন।

এই প্রবন্ধের শেষে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হল। তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রণেতা। তাঁর রচনার মধ্যই স্ফুরিত হয়েছে ভিক্ষু জীবনের অন্য এক উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি। গুণগত উৎকর্ষে প্রতিটি গ্রন্থই অতি উচ্চমানের। বৌদ্ধ সমাজের দুর্বলতা দূর করে তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনেই তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। উপমায়, শব্দ চয়নে, উপলব্ধির প্রত্যক্ষ স্পর্শে তাঁর রচনা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিঘোষণা। ধর্মাধারকে বুঝতে হলে যেতে হবে তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সম্যক বিশ্লেষণে—বিষয় বস্তুর প্রয়োজনেই তাঁর রচনায় কল্পনার রামধনুচ্ছটার চেয়ে মননধর্ম এবং তত্ত্ব ও তথ্যের প্রাধান্য বেশী।

তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলিও এক অমূল্য সম্পদ। মূল 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থটি একটি সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। বৌদ্ধধর্মের যে আদর্শ ও রূপচিত্র এতে চিত্রিত হয়েছে তা আয়ত্ত করার জন্য সমগ্র মানবজাতি যুগ-যুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকবে। এই গ্রন্থখানির অনুবাদে ফুটে উঠেছে তাঁর মৌলিকত্ব। এছাড়া 'মজ্ঝিম নিকায়' (২য়) এবং 'শাসনবংশ' গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ অত্যন্ত মূল্যবান।

ধর্মাধার মহাস্থবির বৌদ্ধ মন্দিরে, বিহারে, সভাসমিতিতে বহু ভাষণ দান করেছেন। তিনি মূলতঃ সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য করার জন্য কলম ধারণও করেননি। তাঁকে ব্যাখ্যাতা বলাই শ্রেয়। তিনি ভিক্ষু, ত্যাগী পুরুষ। কিন্তু তাঁর ভাষণাবলী তাঁকে বৌদ্ধধর্মের সংগঠক ও প্রচারকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। ইহ এবং পারত্রিক কল্যাণ, বৌদ্ধ সমাজের অধঃপতন ও অন্ধকার দূর করে সমাজকে উন্নত করার পথ তিনি প্রদর্শন করেছেন। যে কয়টি ভাষণ তিনি দিয়েছেন সর্বত্রই ফুটে উঠেছে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি তাঁর মমতা। সমাজের দুর্বলতায় তাঁর উৎকণ্ঠা। বৌদ্ধদের মধ্যে নিকায় ভাগ ও কুল ভাগ তাঁকে পীড়িত করেছে। বৌদ্ধ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। বোধ ও বোধির অপরিমেয় ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে, সকল প্রাণীর প্রতি বিগলিত করুণায় যে মানুষ সকলের উর্ধ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর শক্তির মহৎ প্রকাশে, ত্যাগে, বৈরাগ্যে, মৈত্রীতে, কর্মে, সেবার আভিজাত্যে আমরা মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে নতজানু হই। মহাস্থবির হলেন আমাদের কাছে অনুরূপ এক প্রাজ্ঞ পুরুষ।

তাঁর আবির্ভাব-তিরোভাব উভয়ই আজ অতীতের ঘটনা। কিন্তু যে অমূল্য স্মৃতি তাঁকে নিয়ে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়ে আছে তার মধ্যে তাঁর অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আর কিছুই নেই। যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন হতে শেষ শান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত যখন তিনি তাঁর নশ্বর দেহটাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে গেলেন—এই কালসীমাটুকুর

মধ্যে কতটাই বা তাঁকে জানতে পেরেছি বা বুঝতে পেরেছি। আমাদের শাস্ত্রে যাকে জীবন্মুক্ত বলে তিনি ছিলেন তাই। এক অনন্যসাধারণ মানুষ। সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব। সর্বদা সকল অবস্থাতে মানসিক স্থিরতা রক্ষা করতে সমর্থ। নিজের জীবন ব্রত সম্বন্ধে সদা সজাগ, শান্ত সৌম্য স্থিরপ্রজ্ঞ।

তিনি সেই পুরুষ যিনি খণ্ডিত দুই বাংলার জমিনের উপর দু'পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাণপন চেষ্টা করছেন সমান করে এক করে দিতে। বাংলার মানুষ যদি বলতে চায় পণ্ডিত ধর্মাধার আমাদের, ধর্মাধার তাঁদেরই। আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি বলে পণ্ডিত ধর্মাধার আমাদের—পণ্ডিত ধর্মাধার তাঁদেরই।

তিনি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মগুরু বা ধর্ম প্রচারক মাত্র ছিলেন না। তার চেয়ে অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর মনোরাজ্যের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয়, মৈত্রীর মহান ঋষি। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে দেখিনি। সর্ব মানবের কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন মানুষটি ছিলেন মহান মানবদরদী। তিনি তাঁর ধর্মচেতনার ও মানবতাবাদের চিন্তাভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন বৌদ্ধ ধর্মের কলেবর থেকে এবং সেই আদর্শকেই প্রচার করে গেছেন। সর্বোপরি আঁধারের পরপারের আলোকের সেই নির্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

প্রায় ৫২ বৎসর আগের ঘটনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে একদিন বৈকালে আচার্য সুকুমার সেনগুপ্ত বললেন,—'চল, আজ তোমাকে একজনের কাছে নিয়ে যাব। দেখবে একজন খাঁটি ভিক্ষুকে যিনি ভিক্ষু জীবনের আদর্শ। মহাস্থবিরকে সেদিন প্রথম দর্শন করলাম ১নং বুড্ডিষ্ট টেম্পল স্ট্রীটে ধর্মাঙ্কুর বিহারে। তিনি তাঁর নিজের কক্ষে একটি ছোট পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। তাম্রবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্মিত হাস্যময় আনন, সম্ভ্রম জাগানো ব্যক্তিত্ব, উন্নত ললাটে জ্ঞানের ত্রিরেখা, মুণ্ডিত মস্তক, চোখের করুণাঘন জ্যোতি, ধীর স্থির কণ্ঠস্বরের মূর্ছনা। প্রশান্ত মহিমায় যিনি বসে আছেন তিনিই পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। তিনি মৃদু হেসে আহ্বান জানালেন। স্যার অনুরোধ করলেন—'ভন্তে এই ছাত্রীটিকে আপনি পালি ভাষা শিখিয়ে তৈরী করে দিন।' পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হয়ে প্রবেশ করে মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু তথ্যের জন্য তাঁর কাছে যেতাম। তিনি খুব সংক্ষেপে ধীর স্থির ভাবে আলোচনা করতেন। কণ্ঠ অনুচ্চ।

আরো একটা দিন আমার জীবনে ধ্রুব তারার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আজও দীপ্ত হয়ে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমি ডক্টরেট হয়েছি। আমার গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। একটি কপি নিয়ে ভন্তেকে দিতে গেছি। আমাকে দরজায় দেখে ভিতরে ডাকলেন। আমি প্রণাম করে বইটি রাখলাম। তিনি বইটি একটু পড়ে দেখলেন। বললেন—

"অ ধন, তুমি যা করেছ তা অসাধারণ। তুমি আমাদের ঘরে জন্মালে না কেন? আমাদের ঘরের মেয়েরা যে শিক্ষায় বড় পিছিয়ে আছে।" ভন্তের মধ্যে সেদিন একান্তই বৌদ্ধ সমাজের জন্য দরদী একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বললাম, "ভন্তে, আমি তো আপনাদেরই মেয়ে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আমি আরো পড়াশুনা করব। বই লিখব।"— ভন্তে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—"তুমি পারবে। আরো লেখ। পড়াশুনা কর।" মনে হল জীবনে এর থেকে বড় প্রাপ্তি যেন আর কিছুই হতে পারে না। ভন্তের সান্নিধ্যে আসা অবধি তিনি আমার শক্তি সামর্থ্যকে এতটাই বাড়িয়ে তুলে ধরতেন যে একটা অদম্য জ্ঞান পিপাসা আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠত। আমি সংসার জীবনের আর কিছুই ভাবতে পারিনি। জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধ সাহিত্য অনুধ্যানই জীবনের লক্ষ্যবস্তু রূপে নির্ধারণ করতে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার জীবনে যে সকল স্মরণীয় ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছি, যাঁদের কল্যাণময় প্রভাব এখনও আমার জীবনে সক্রিয় রয়েছে সেই স্মরণীয়দের মধ্যে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অন্যতম।

শতবর্ষের দ্বার সন্নিকটে এসে তিনি নির্বাণলোকে চির অস্তগত হলেন। সেদিনের সেই বেদনা বিধুর স্মৃতি আজও মনকে তোলপার করতে থাকে। মহাস্থবিরের শবদেহ নিয়ে কলিকাতার পথে-পথে শোভাযাত্রা চলছিল। ধীর মন্থর গতিতে শোভাযাত্রা মহাবোধির কাছ দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে শ্মশান ভূমিতে নীত হয়েছিল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মহাস্থবিরের মরদেহ শেষবার দর্শন করলাম। প্রজ্ঞার পবিত্র সূর্যাস্ত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বলে চলেছেন—

অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদবয়ধম্মিনো।
উপজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো।।

আকাশ-পৃথিবী সব একাকার—
পূরম পূর্ণতায়।
হে মহাজীবন,
আপনার জয় হোক, শুভ হোক, শান্তি হোক
তিনি সেই পথের যাত্রী হলেন
য়থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি,
ন তথ সুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো নপ্পকাসতি।
ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি
য়দা চ অত্তনা বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মনো
অথ রূপ অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতী'তি।

আপনাকে প্রণাম।
আপনাকে প্রণাম।
আপনাকে প্রণাম।

অতি অল্প কথায় মহাস্থবির ধর্মাধারের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ অক্ষরাঞ্জলি নিবেদন করলাম। এতে আমার মন তৃপ্ত হল না। তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাঁর যে স্মৃতি আমার মনকে সুরভিত করে রেখেছে তা প্রকাশ করতে যে শব্দ বৈভব ও লেখনি-চালন শক্তি আবশ্যক আজ আমার তা নেই। এজন্য আমি নিজেকে সঙ্কুচিত বোধ করছি। 'বৌদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের অমল স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র অর্ঘ্য। এই প্রবন্ধে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেছি। এই গ্রন্থে শরীর বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রসঙ্গে মৌল গবেষণার ফসল সুরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি ধর্মাধার মহাস্থবির অনুবাদ করেছেন। আচার্য ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Medical Data in the Milindapanha' (Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume, 1989 p. 111.) এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

R. B. Barua, His Holiness Sangharaj Pandit Dharmadhar Mahasthavir, Calcutta, Dharmadhar Bauddha Grantha Prakashani, 2000.

অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মারক বক্তৃতা—২০০৯, কলিকাতা, ধর্মাধার স্মৃতি রক্ষা সমিতি ও নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন, ২০০৯।

জিনবোধি ভিক্ষু, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, কলিকাতা, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯১।

বৌদ্ধ বন্ধু পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

Ashin Wimala Thera, সংঘরাজ সারমেধ মহাথের-এর জীবনী, ১৯৬৩।

ধর্মাধার মহাস্থবিরের সমস্ত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধ।

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের রচিত গ্রন্থাবলী

১। মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ)
২। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন
৩। মধ্যম নিকায় (২য় খণ্ড, বঙ্গানুবাদ)
৪। ধর্মপদ (সমূল বঙ্গানুবাদ)
৫। শাসনবংশ (বঙ্গানুবাদ)
৬। সদ্ধর্মের পুনরুত্থান
৭। অধিমাস বিনিশ্চয়
৮। রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন (বঙ্গানুবাদ)
৯। বুদ্ধ বন্দনা
১০। বর্ষাবাস বিব্রাট

বৌদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান

বৌদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভারতের সামগ্রিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসেরই অঙ্গ। ইহাকে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের একটি তরঙ্গও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে যে গ্রন্থটির নাম প্রথমেই মনে পড়ে তা হল বোয়ার পুথি। জীবন অভিমুখী কর্মে, প্রজ্ঞায়, মেধায় সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সর্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী রূপ-চিত্র বোয়ার পুথি (Bower Manuscript) পরম মর্যাদায় সেখানে আসন পেয়েছে। বৃটিশ লেফটেনিস্ট এ. বোয়ার এর আবিষ্কারক। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে এটি পাওয়া গেছে। আবিষ্কারকের নামানুসারে পুথির নামকরণ হয়েছে। সম্ভবতঃ ইহা হিন্দু গবেষক চিকিৎসক কোনন্দ দ্বারা ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। গ্রন্থে বুদ্ধ প্রশস্তি বাচক শব্দ 'বুদ্ধ', 'তথাগত' উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় গুপ্ত Script-এ রচিত এবং ভূর্জপত্রে লিখিত। বর্তমান পুথিটির বৈশিষ্ট্য হল—

১। Romanised, Fascimile leaves.

২। English Translation and Transliteration with notes.

৩। Ed. A.F.R. Hoernle

৪। Part 1, 2, Archaelogical Survey of India, New Imperial Series.

৫। Vol. 22, 1893-1912

পুথিটি একটি বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গেছে। মন্দিরটি চাইনিজ তারকিস্থানের অন্তর্গত কুচ (Kuch) এ অবস্থিত। হস্তলিপি বিজ্ঞান (Palaegraphic) প্রমাণ দ্বারা জানা যায় ইহার উৎপত্তি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। পুথিতে সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ঔষধ ও ঔষধ-প্রস্তুত বিদ্যা সংক্রান্ত (medical and pharmaceutical monographs), কল্প ও তন্ত্র (Kalpa and Treatise) আলোচিত হয়েছে। অনেক অধ্যায় চরকের সঙ্গে প্রায় এক। কিন্তু কোথাও চরকের নাম উল্লিখিত হয়নি। যদিও সুশ্রুত যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। পুথিটি আমাদের চরক ও সুশ্রুতের কালনির্ঘন্ট (chronology) প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। বোয়ার পুথির অন্তর্গত ৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। চীন দেশের অন্তর্গত কাসগড়ের একটি বৌদ্ধ স্তূপ হতে এগুলি উত্থোলিত হয়।

পুথিতে উল্লিখিত যবক্ষর এবং সরজিকক্ষর (Yava-Kshara and Sarjika Kshara) হল দুটি এলকালিন (alkalines)। এর দ্বারা দুটি অঙ্গারাম্ল (carbonates of Potash) এবং soda সম্বন্ধে জানা যায়। হিক্কার (Hinccough) প্রতিশোধকরূপে শিং-এর ধোঁয়ার (fumes of horn) উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ইহা হল—same as

'spirits of hartshorn'. গাছপালা দগ্ধ করে alkali বা patash carbonate প্রস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে Ksharataila ব্যবহারে কর্ণের রোগ নিরাময় হয়। (Part II, fase ii, p. 131) hair-Dye প্রস্তুত করার প্রণালীও পাওয়া যায় (Pt II, fase ii, p. 162)। বলা হয়েছে, Sulphates and Copper লৌহপাত্রে হরিতকীসহ (beleric myrobalans) সিদ্ধ করে দিলে সাদা চুল কালো করা যেতে পারে। স্রোতজ অঞ্জন, নীলাঞ্জন, লাল গিরিমাটি, গন্ধক, চুন ও ধাতুভস্ম, পিতল এবং মনঃশিলা ইত্যাদি ঔষধে ব্যবহার করা হত বলে উল্লেখ আছে। (Ibid, p. 131) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রস্তুতিকরণ Bower M/S-এ উল্লেখ আছে। এগুলি চরক ও সুশ্রুতের সঙ্গে হুবহু এক। সরস্বতী ঘৃতের উল্লেখ আছে। ইহা ব্যবহৃত হয়েছে নারীর গর্ভধারণে অক্ষমতা (Sterility) এবং পুরুষের পুরুষত্বহীনতার (Impotency) প্রতিষেধকরূপে। বাক্‌শক্তি, স্মৃতি এবং বুদ্ধির বৃদ্ধিকল্পেও সরস্বতী ঘৃতের নিদান দেওয়া হয়েছে। ঔষধ ও রোগনিরাময় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থদীপ্ত ভাষায় বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে এই মহাগ্রন্থে।

আরো একটু পিছিয়ে বিস্তৃতভাবে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছি। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র একটি ফুল্লকুসুমিত বৃক্ষ সদৃশ। মাটির তলদেশে থাকে দৃঢ় সান্নিধ্য শিকড়জাল। সেখান থেকে রসধারা সংগ্রহ করে ঊর্ধ্বের তরুণ বৃক্ষশাখায় ফুল ফোটায়। বৃক্ষ ফুল্লকুসুমিত হয়ে উঠে। প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে রসধারা সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে পরবর্তী কালের চিকিৎসা শাস্ত্র। কেবল সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষাই নয় পালি ভাষায়ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এঁরা সর্বাত্মক বিনষ্টির হাত থেকে বৌদ্ধ চিকিৎসা বিদ্যাকে রক্ষা করেছেন।

১২৬১ সালে অনোমদস্‌সি সঙ্ঘরাজ একটি চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম 'ভেসজ্জ মঞ্জুসা' (The Casket of Medicine)। গ্রন্থটি পালি ভাষায় লিখিত। গ্রন্থে ষাটটি অধ্যায় রয়েছে। পালি ভাষায় রচিত এটিই একমাত্র চিকিৎসা গ্রন্থ। পঞ্চ পরিবেণ অধিপতি বা 'পস মূল মহাসামি' সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের রচয়িতা। মহাবংসে বলা হয়েছে (XC vii, vv 59-62) গ্রন্থটি দম্বদেনিয়-এর পরাক্রম বাহুর সময়ে রচিত। লেখক পরিবেণের একজন বিজ্ঞ ও পরোপকারেচ্ছু ভিক্ষু প্রধান। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যাদি পালন করছেন তাঁদের রোগ ব্যাধির উপশম করে সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা। মহাবংসে আরো বলা হয়েছে পৃথিবীতে দু'প্রকার ব্যাধি আছে যা দ্বারা ভিক্ষু শ্রমণগণ রোগাক্রান্ত হন — দেহগত ও মনোগত। এর মধ্যে মনোরোগের চিকিৎসক হলেন শাস্তা বুদ্ধ। বিনয় ও সুত্তন্ত দ্বারা তিনি মানসিক উন্নতি বিধান করেন। কিন্তু রোগাক্রান্ত দেহ ভিক্ষুর পক্ষে বিনয় ও সুত্তন্তের নিয়ম ও উপদেশাবলী পালন করা কঠিন।

সিংহলের আর একটি চিকিৎসাগ্রন্থের নাম 'যোগরত্নাকর'। গ্রন্থটি ১৪শ শতকে সংকলিত (History of Pali literature in Ceylon, Malalasekera, p. 216)

গ্রন্থের উপসংহারে বলা হয়েছে 'ভেসজ্জ মঞ্জুসা' হল পালি ভাষায় রচিত একটি চিকিৎসা গ্রন্থ। অত্থদস্সী ভিক্ষু ইহার রচয়িতা। সময় ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। যদি এই তথ্য সঠিক হয় তবে লেখক অবশ্যই পঞ্চ মূল পরিবেণের অধিপতি। ব্রহ্মদেশের পেগানের একটি শিলালিপিতে 'ভেসজ্জ মঞ্জুসার' উল্লেখ আছে। শিলালিপিটি ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। জানা যায় মঞ্জুসার লেখক ইহার একটি টীকাও রচনা করেন। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য। ভেসজ্জ মঞ্জুসার একটি সিংহলী 'Sanneও রচিত হয়েছে। রাজা কীর্তিশ্রীর অনুপ্রেরণায় ভিক্ষুদের উপকারের জন্য ইহা রচিত।

এ সময় সরণঙ্করের চারপাশে galaxy of brilliant scholars ভিক্ষু উপাসক সমবেত হয়েছিলেন। এঁরা সরণঙ্করের কাছে চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেণ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তাঁরা সিংহলী বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে যে অভাব ছিল তা পূরণ করেন।

মঞ্জুসা একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল। উন্নততর সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থের প্রভাবে ইহার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে। বর্তমান এই গ্রন্থ বিশেষ আলোচনা করা হয় না।

বৌদ্ধ যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি মৌলিক দিকগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত পালি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেমন—

১। **খুদ্দক পাঠ**—মানবদেহের ৩২ প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা দ্বাত্তিংসাকার। যথা—

কেশ	অন্ত্রগুণ
লোম	উদর
নখ	বিষ্ঠা
দন্ত	পিত্ত
চর্ম	শ্লেষ্মা
মাংস	পূঁয
স্নায়ু	রক্ত
অস্থি	স্বেদ
অস্থিমজ্জা	মেদ
বৃক্ক	অশ্রু
হৃদয়পিণ্ড	চর্বি
যকৃৎ	থুথু
ক্লোম	সিকনি
প্লীহা	গ্রন্থীতৈল
ফুসফুস	মূত্র
অন্ত্র	মগজ

এখানে মগজের উল্লেখ রয়েছে।

২। **লক্ষণ সুত্তন্ত**—(দীঘ, ৩য়) মহাপুরুষের দেহের ৩২টি অনন্যসাধারণ লক্ষণের আবিষ্কারের উন্মোচন ঘটেছে। মানবদেহের কিছু-কিছু বর্ণনাও প্রসঙ্গক্রমে স্থান পেয়েছে।

৩। **মহাসতিপট্টান সুত্ত** (দীঘ, ২য়)

৪। **সংযুক্ত নিকায়**—কায়গতা স্মৃতি ভাবনায় শরীরের ৩২ প্রকার অশুচি বিষয় স্থান পেয়েছে।

৫। **মহাবগ্গ**— ভৈষজ্য স্কন্ধ-এ 'ভেসজ্জ গুরু'র প্রজ্ঞার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ভৈষজ্য ও তার প্রস্তুত প্রণালী, নানাবিধ রোগ ও নিরাময় ব্যবস্থা খাদ্য ও খাদ্যগুণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সত্যেরই আবিষ্কার ঘটেছে।

৬। **বিভঙ্গ**—এ গ্রন্থে মানবদেহের ৩১টি অঙ্গের উল্লেখ আছে।

৭। **বিসুদ্ধিমগ্গ** (খ্রী ৫ম শতাব্দী) আচার্য বুদ্ধঘোষের সর্বজন ও সর্বদেশ গ্রাহ্য কীর্তি। তিনি কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শনেই পারঙ্গম ছিলেন না। মানব দেহ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ করে রক্ত সঞ্চালন (Blood Circulation) ক্রিয়া সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্য নব-নব সত্যের আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচন করেছে। কায়গতানুস্মৃতি ধ্যান এর জন্য মানবদেহের ৩২ প্রকার অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও জৈব তরল পদার্থের নাম করেছেন। যেমন—

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনি, লসিকা, মূত্র। বুদ্ধঘোষ অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, পাকস্থলী বা উদরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন অন্ত্র পুরুষ দেহে ৩২ হাত, নারী দেহে ২৮ হাত। এগুলিই হয় ত বর্তমান শরীর স্থানের ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্ত্র। পাচনতন্ত্র বা Digestive system এর বর্ণনাও সুস্পষ্ট। পক্কাসয় ও আমাসয় এর বর্ণনা রয়েছে। পৌষ্টিক নালী—মুখ গহ্বর, গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, মলাশয় নিয়ে গঠিত। বিশুদ্ধিমগ্গে বলা হয়েছে— আহারের পর খাদ্যবস্তু কীভাবে পরিপাক হয়ে করীষ, রস, শোণিত এবং মাংসাদিতে পরিণত হয়। মানবদেহ ৭টি উপাদানের সমষ্টি রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র।

৮। **পরমত্থজোতিকা** এবং **অত্থসালিনী** গ্রন্থেও হৃদয় এবং হৃদয় বাস্তু সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। রক্ত সংবহন ক্রিয়ারও সম্যক পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

৯। **মিলিন্দ প্রশ্ন**—এ গ্রন্থ বৌদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অনবদ্য তথ্য মঞ্জুষা। realism and idealism এর সমন্বয়ে বৌদ্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করছে।

যদিও বিভিন্ন পালি গ্রন্থে মানবদেহের বর্ণনা বিস্তৃতাকারে স্থান পেয়েছে তা সত্ত্বেও মহাবগ্গের 'ভৈষজ্য স্কন্ধ' এবং 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থ বৌদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রজ্ঞা প্রদীপ্ত বিষয় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

ভগবান বুদ্ধ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভীষক। তিনি কেবল আধ্যাত্মিক পথই প্রদর্শন করেননি, মানবিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি—কর্মে, মেধায়, ধর্মে, নিরাময়ে সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধ জীবনের গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধানও দিয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম ধ্যান ধারণা, সুউচ্চ চিন্তাভাবনা ও নীরোগ সমুন্নত জীবন রচনার মহোত্তম আদর্শ বিধৃত হয়ে আছে এই গ্রন্থসমূহে। যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম ভিক্ষুধর্মাশ্রয়ী এবং সঙ্ঘ জীবনই এখানে মুখ্য সেজন্য সঙ্ঘের ভিক্ষুদের নানা রোগ নিরাময় উপলক্ষ করে মহাবগ্গে ভগবানের নিদান সমূহ উদগীত হয়েছে।

শারদীয় রোগ (Autumnal disease)

এই রোগে ভুক্ত দ্রব্য এবং অন্ন বমি হয়ে যায়। ভিক্ষুরা এ রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁরা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হলেন। তাঁদের গাত্র ধমনি আচ্ছন্ন হল। ভগবান বিধান দিলেন পঞ্চবিধ ভৈষজ্য—চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু, খাঁড় বা শক্ত গুড় এগুলি সকালে ও বিকালে সেবনীয়। এগুলি ভৈষজ্য আবার আহার্যও বটে। কিন্তু আহারের মধ্যে পরিগণিত হয় না। এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভিক্ষুরা সপ্তাহকাল পরিভোগ করিবে। এই রোগে নিম্নলিখিত ভৈষজ্যাদি প্রয়োজন মত গৃহীত হতে পারে। যথা—

চর্বি সংযুক্ত ভৈষজ্য (Fat admixed medicine)

পীড়িত ভিক্ষুগণের জন্য ভৈষজ্যের প্রয়োজন হলে ভগবান চর্বি মিশ্রিত ভৈষজ্যের নিদান দেন। যেমন ভল্লুকের চর্বি, মৎসের চর্বি, শিশুমারের চর্বি, শূকরের চর্বি, গর্দভের চর্বি সকালে সেবন করণীয়।

মূল সংযুক্ত ভৈষজ্য (Root medicine)

হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, বচস্থ, অতিবিষ, কটুকরোহিণী, উশীর (বেনার মূল) ভদ্রমুস্তক (নাগর মোথা) যা খাদ্যে ভোজ্য রূপে ব্যবহৃত হয় না তা ব্যবহার এবং আজীবন ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেন।

কষায় সংযুক্ত ভৈষজ্য (Bitter taste medicine)

নিম্ব, পটল, পল্লব, নস্তমাল ইত্যাদির কষায় প্রতিগ্রহণ এবং আজীবন প্রয়োজন মত সেবনের নির্দেশ দেন।

পত্র ভৈষজ্য (Leaf-medicine)

নিম্ব, গিরিমল্লিকা, পটোল, তুলসী, কার্পাস পত্র এবং খাদ্য ভোজ্য রূপে ব্যবহৃত হয় না এমন পত্র রস সেবন এবং প্রয়োজনে আজীবন সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

ফল ভৈষজ্য (Fruit-medicine)

বিড়ঙ্গ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল, ও অন্যান্য যে সব ফল খাদ্য ভোজ্য নয় তা প্রতিগ্রহণ ও আজীবন সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেন।

জতু সংমিশ্রিত ভৈষজ্য (Lac mixed medicine)

হিঙ্গু, হিঙ্গুজতু, হিঙ্গুসিপাটিক, তক, তকপত্তি, তকপর্ণী, সর্জরস ইত্যাদি প্রতিগ্রহণ করা যাবে।

লবণ ভৈষজ্য (Salt-medicine)

সামুদ্রিক লবণ, কাল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বানস্পতিক লবণ, বিট লবণ। এছাড়া যত প্রকার লবণ আছে সবই প্রয়োগ করা যাবে।

কণ্ডু (চুলকানি) স্কোটক, আস্রব, খোস রোগ সুনিপুণ চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করার নির্দেশ দেন।

ভিক্ষু বরিষ্ঠশীর্ষ ছিলেন আনন্দের উপাধ্যায়। তিনি খোস রোগে আক্রান্ত হলেন। ভগবান তাঁর জন্য গোময়, মৃত্তিকা, রজন নিপক্ক বা পাক করা রঙের চূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

অমনুষ্য জনিত রোগ Diseses from superhuman being)

ভগবান এ রোগে কাঁচা ও টাট্‌কা রক্ত ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

চক্ষুরোগ (Eye diseses)

চক্ষুরোগী ভিক্ষুর রোগ উপশমের জন্য বিভিন্ন অঞ্জনের ব্যবহার ভগবান অনুমোদন করেছেন। যেমন—অঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতাঞ্জন, গোরিমাটি, কপাল্ল (কজ্জল, প্রদীপ শিখা হতে গৃহীত মসী) ইত্যাদি। চন্দন, তগর, কালানুসারী, তালিশ এবং ভদ্রমুস্তক বা নাগরমোথা অঞ্জনের সঙ্গে পিষবার দ্রব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার্য।

শিরোরোগ (Cephalitis)

ভিক্ষু পিলিন্দবৎস শিরোরোগে আক্রান্ত হলেন। ভগবান নিদান দিলেন শিরে তৈল ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু তৈল ব্যবহারে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। ভগবান নস্য ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নস্যের দ্বারাও রোগ নিরাময় হল না। অবশেষে ভগবান ঔষধের জন্য ধূমপানের নির্দেশ দিলেন।

বাতরোগ (Rhyeumatism)

রোগী ভিক্ষু পিলিন্দবৎস। ভগবান বৈদ্যের প্রস্তুত তৈলে মদ্য মিশ্রণের নির্দেশ দিলেন। পিলিন্দবৎসের অঙ্গবাতে স্বেদমোচনের ব্যবস্থা দিলেন। স্বেদ মোচনের নানা প্রকার পদ্ধতি ছিল। যথা—সম্ভার স্বেদ, মহাস্বেদ, ভঙ্গোদক এবং উদক কোষ্ঠক ইত্যাদি।

গাঁটারী বাত (Bundle rhyeumatism)

শিঙ্গার সাহায্যে রক্তমোচনের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। পদতলে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য তৈল মালিশ এবং পায়ের ঔষধ ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন।

গণ্ডুরোগ বা স্ফোটকে অস্ত্রোপচারের নির্দেশও প্রদত্ত হয়। তাছাড়া গোমুত্রে হরিতকী ভিজিয়ে পান করা হবে।

ব্রণ রোগ (Boil or tumour)

সর্ষপের খোসা দ্বারা সেঁকা প্রদান ইত্যাদি ভগবান অনুমোদন করেন।

চর্মরোগ (Skin diseses)

গন্ধকের প্রলেপ। বদহজমে বিরেচক পান করার নিদান দিয়েছেন।

বিভিন্ন রোগে ভাত পরিশ্রাবন করে জল, অকট যূষ, কটাকট যূষ, মাংসের যূষ সেবন করণীয়। মুগের অঙ্কুরোদগমও গ্রহণীয়।

সর্প-দংশন চিকিৎসা (Snake bite treatment)

বাহ্য, প্রস্রাব, ভস্ম, মৃত্তিকা চতুর্বিধ উৎকট দ্রব্য সেবনীয়। বিষ পান করলে মল ভক্ষণের নির্দেশ রয়েছে।

বায়ুরোগ (Neurosis)

বেণার মূল সেবণীয়। নীরোগী ব্যক্তিও জলে মিশ্রিত করে পানীয়ের ন্যায় সেবন করতে পারে। এ রোগ নানা ভাবে দেখা দেয়—অঙ্গবাত, উদরবাত, কর্মজবাত, কুক্ষিবাত, পীষ্ঠবাত ইত্যাদি।

অস্ত্রোপচার (Surgery)

ভগবান বুদ্ধের সময় আকাশগোত্র নামে একজন বৈদ্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রোপচার করতেন। ইনি জনৈক ভিক্ষুর ভগন্দর রোগে অস্ত্রোপচার করেন। ভগবান শুনে বললেন—গুপ্তস্থানের ত্বক কোমল, ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না। অস্ত্র চালনা করাও কঠিন। সুতরাং গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার না করাই উচিত।

সংযুক্ত নিকায় (৫ম খণ্ড)-এর 'গিরিমানন্দ সুত্ত' চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পূর্ণ পরিচয়ের সুষ্ঠু পরিচায়ক। এই সুত্তে মানবদেহের পায়ের তলদেশ হতে উর্ধ্বে মাথার কেশ পর্যন্ত নানা প্রকার অশুচি দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে বলা হয়েছে। যেমন—

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, পেশীতন্তু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর্য, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, থুথু, সিকনী, লসিকা, মূত্র।

বলা হয়েছে মানব দেহে রয়েছে বহু আদীনব। এই আদীনব সৃষ্টি করে বহু রোগ। যথা—চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বা রোগ, কায় রোগ, শির রোগ, কর্ণ রোগ, মুখ রোগ, দন্ত রোগ, কাশ, শ্বাস বা হাঁপানী, সর্দি, দাহ, জর, পেটের রোগ, মূর্ছা, আমাশয়, সূল, কলেরা, কুষ্ঠ, ফোঁড়া, একজিমা, যক্ষ্মা, অপমার বা মৃগী রোগ, দাদ, কণ্ডু বা চুলকানি, খোস পাঁচড়া, চর্মরোগ, খোস, পাণ্ডুরোগ, বহুমূত্র, অর্শ, বিষফোঁড়া, ভগন্দর, পিত্তরোগ, শ্লেষ্মা রোগ, বাতব্যাধি, বায়ুজাত রোগ, শারীরিক রস জাত রোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তন রোগ, শরীরের অতিরিক্ত চাপের ফলে উৎপন্ন রোগ, কর্ম বিপাক রোগ, শীত-উষ্ণ-ক্ষুধা-পিপাসা-

মল-মূত্র জনিত রোগ। ভিক্ষুদের আদীনব সংজ্ঞার জ্ঞান দানের জন্য এই সুত্তে তথ্য ও বিষয় বস্তু প্রাধান্য পেয়েছে।

রোগের কারণ

বৌদ্ধ সাহিত্যে রোগের কারণ সমূহও বর্ণিত হয়েছে। মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, নিদ্দেস, মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থানুযায়ী রোগের কারণ হল—

১। পিত্ত,

২। শ্লেষ্মা,

৩। বায়ু

৪। শারীরিক তরল পদার্থের সংমিশ্রণ বা সন্নিবাতিক রোগ

৫। ঋতু পরিবর্তন

৬। শরীরে অতিরিক্ত চাপ

৭। শরীরের কোনও অঙ্গের সংকোচন

৮। কর্মের বিপাক

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সত্যক্রিয়া, সংস্কার জাত প্রভাবে চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা, ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ বা ভৈষজ্য চিকিৎসা এবং শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভ্রূণের উৎপত্তি ভ্রূণতন্ত্ত তত্ত্বটিও বৌদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি সংযোজন। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রতিসন্ধির পূর্বে কতকগুলি ঘটনা পরম্পরা থাকে। যার অভাবে প্রতিসন্ধি হয় না। যেমন—

"মাতা চ উতুনী হোতি, পিতুনো সন্নিপাতো চ, গন্ধবেবা চ পচ্চুপট্ঠিতো—তিন্নং সঙ্গ তি হোতি গব্ভস্স অবক্কন্তি।" জন্মান্বেষণকারী চেতনা হলেন গন্ধর্ব। প্রথম কারণদ্বয় উপস্থিত থাকলে কর্মানুসারে তৃতীয়ের অধিষ্ঠান হয়। বলা হয়েছে কারণত্রয় একক্ষণে উপস্থিত হয় না। প্রত্যেকটি পর-পর দ্বাদশ দিনের মধ্যে সংযুক্ত হতে পারে। ভ্রূণের অবস্থাপরম্পরা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পঠমং কললং হোতি কললা হোতি অব্বুদং।

অব্বুদা জায়তে পেসি পেসি নিব্বত্ততে ঘনো

ঘনা পসাখা জায়ন্তি কেসা লোম নখানি চ। (সংযুক্ত নিকায়)

মাতৃপিতৃ পরম্পরাদ্বয় সংযোগ হলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা হল কলল। কলল হতে অর্বুদ উৎপন্ন হয়। অর্বুদ হতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মাংসপেশী জন্মে। পেশি ক্রমে ঘনাকার ধারণ করে। তা হতে শাখাপ্রশাখা রূপ হস্তপদাদি উৎপন্ন হয়। সপ্তম মাসের মধ্যে কেশ লোম নখাদি দ্বারা সুশোভিত হয়ে থাকে। কিঞ্চিৎ উন দশ মাসের মধ্যে জীব ভূমিষ্ঠ হয়।

আধুনিক জীববিজ্ঞানের সঙ্গে এই তথ্যসমূহের কোনও বিরোধ নেই। মানুষের ভ্রূণের

গঠনের বিভিন্ন ধাপ (Different stages of development of human Embryo) প্রায় একই রূপ।

পরিচারক বা nurse এর যোগ্যতা

পালি সাহিত্যে বিভিন্ন জায়গায় nurse এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ আছে। পালি ভাষায় পরিচারককে বলা হয়েছে কপ্পিয়কারক বা কার্যকারক

১। এ ব্যক্তি ঔষধ প্রয়োগের বিষয়ে অপার অভিনিবেশ রাখবেন।

২। রোগীর সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ থাকবে। তিনি রোগীর পক্ষে অনুকূল-প্রতিকূল সম্বন্ধে সচেতন হবেন। প্রতিকূল অপসারিত করবেন। অনুকূল বিধান করবেন।

৩। পরিচারক মৈত্রী চিত্তে রোগীর সেবা করবেন। কোনও ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশায় নয়।

৪। তিনি রোগীর মল-মূত্র-বমি-থুথু পরিষ্কার করতে ঘৃণাবোধ করেন না।

৫। রোগীকে সময়-সময় উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ ও আনন্দিত করবেন।

গ্রন্থ চিকিৎসা (Bibliotherapy)

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে গ্রন্থ চিকিৎসা বা Bibliotherapy ভগবান বুদ্ধের নিজস্ব অবদান। তিনিই এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। তিনি ছিলেন দক্ষ ত্রিকালদর্শী Psychologist। রোগীর যা কিছু কষ্ট ও রোগ যন্ত্রণা তিনি স্থির চিত্তে ও দৃঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোনও ঔষধ নয়, গ্রন্থ চিকিৎসার নিদান প্রদান করেন। গ্রন্থ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন—

১। রোগী

২। চিকিৎসক। তিনি Psychologist হবেন।

৩। শুশ্রূষাকারী বা পরিসেবক

৪। রোগীর উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচন

গ্রন্থ চিকিৎসার তথ্য পাওয়া যায় পরিত্ত সুত্ত পাঠ সম্বন্ধে ভগবানের নির্দেশে। অঙ্গুলিমাল সুত্তে পরিত্ত পাঠের ফলে প্রসূতির সুপ্রসব হয়। গিরিমানন্দ সুত্ত-এ আয়ুষ্মান গিরিমানন্দ পীড়াদায়ক ক্ষত রোগে আক্রান্ত হলে আনন্দ তাঁকে দশসংজ্ঞা পাঠ করে শোনান। দশ সংজ্ঞা হল—অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, আদীনব সংজ্ঞা, পরিহার বা বর্জন সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, নিরোধ সংজ্ঞা, সর্বলোক অনভিরতি সংজ্ঞা, সর্বসংস্কারে অনিত্যসংজ্ঞা এবং আনাপান স্মৃতি সংজ্ঞা।

জিনপঞ্জর গাথা শুনে মৃত্যুপথ যাত্রী বালক ১২০ বৎসর আয়ু লাভ করে।

খাদ্য ও ভোজ্যবস্তু (Food & Diet)

আচার্য বুদ্ধ ঘোষের মতে খাদ্যবস্তু ৪ প্রকার। যথা—

১। অন্ন, রুটি

২। তরল খাদ্য

৩। কঠিন খাদ্যবস্তু

৪। রসনা-তৃপ্ত খাদ্যবস্তু

তরল খাদ্য বস্তুর মধ্যে যবাগূ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাতকালীন গ্রহণীয় খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। যবাগূর দশপ্রকার উপযোগিতার বিষয় মহাবগ্গে বলা হয়েছে। যেমন—

১। যবাগূ আয়ু দান করে।

২। বর্ণ দান করে।

৩। সুখ দান করে।

৪। বল দান করে।

৫। প্রতিভা দান করে।

৬। ক্ষুধা নিবারিত হয়।

৭। যবাগূ পিপাসা শান্ত করে।

৮। বায়ু অনুকূল করে।

৯। প্রস্রাব শোধন করে।

১০। অপক্ক পরিপাক করে।

ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে জল ও খাদ্যবিহীন বনপথে যাত্রা সময়ে পঞ্চবিধ গোরস যথা—ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত এবং চর্বি পরিভোগ করার আদেশ দেন। অষ্টবিধ পানীয় এবং ধান্যের রস, পক্ক পাতার রস, মধুক ফুলের রস, ইক্ষু রস গ্রহণের অনুমতি দান করেন। অষ্টবিধ পানীয় হল—আম, জাম, বন্য কদলী, গ্রাম্য কদলী, মধু, আঙ্গুর, শালুক, ফলসা বা দাড়িম্ব ইত্যাদির রস। শাক ও পিষ্টক এবং সর্বপ্রকারের ফলও ভিক্ষুদের খাদ্য তালিকার অন্তর্গত ছিল। খাদ্যবস্তুকে ভগবান যাবৎকালিক, যামিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

বুদ্ধের চারি আর্যসত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। চিকিৎসকও প্রথম রোগ diagnosis করেন, পরে রোগের কারণ বা causes নির্ণয় করেন। তারপর রোগ নিরাময় করার বিষয় ভাবেন। সর্বশেষ তিনি remedy প্রয়োগ করেন। দুঃখ হল রোগ। কামনা রোগের কারণ, কামনা বা craving দূর করতে হবে। রোগ মুক্তি efficacy of illness is removed। ইহাই রোগ মুক্তি। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের গৌরবের যুগের অবসান হয়। একটা পরিবর্তনের আবহাওয়া আসে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও ব্যবস্থায়। বুদ্ধ ছিলেন ভবরোগের পরম বৈদ্য, শল্যচিকিৎসক—অনুত্তরো ভিসক্কো সল্লকত্তো। বুদ্ধ নিজেকে সল্লকত্তো, ভিসক্কো, চিকিচ্ছকো বলেছেন, (সুত্তনিপাত, v, p 560,

ইতিবুত্তকো, পৃ, ১০৬)। তিনি ঘোষণা করেন চারি আর্যসত্য হল ভব ব্যাধির antidotes বা অগধানি। চারি আর্যসত্য—

দুঃখ (suffering) আছে।

দুঃখ সমুদয় (The Arising of Suffering) আছে।

দুঃখ নিরোধ (The Cessation of Suffering) করা যায়।

দুঃখ নিরোধগামিনী পটিপদা (The Path leading to the Cessation of Suffering) হল দুঃখ নিরোধের উপায়।

'চত্তারি অরিয় সচ্চানি' এবং 'সত্ততিংস বোধিপক্খিয় ধম্মা' তাঁর দোকানের ঔষধ। এ দিয়ে তিনি বিশ্বকে এবং দেবতাদের ক্লেশ দোষ মুক্ত করেন। 'ভগবা সদেবকং লোকং কিলেসবিসতো পরিমোচেতি'। (মিলিন্দপ্রশ্ন, পৃ ৩৩৪)। তিনি বিরেচন, বমন দ্বারা সমস্ত প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি দোষ মুক্ত করেন। এবং সত্যোপলব্ধি করান। পালি 'অগদাপন' 'ওসধাপন' শব্দ দ্বারা মনে করা যেতে পারে সেই প্রাচীন যুগেও দেশে ড্রাগিস্ট বা ফার্মেসী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল।

চিকিৎসকদের সমাজে জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানও পেতেন। সংস্কৃত বৈদ্য শব্দ পালিতে বেজ্জ, চিকিৎসা—তিকিচ্ছা, ভীষক—ভিসক্কো এবং শল্যবিদ—সল্লকত্তো বা (Surgeon) বলা হয়েছে। ভিসক্কো এবং সল্লকত্তো—যদিও সমাজে দৈনন্দিন জীবনে এঁদের কাজের পার্থক্য রয়েছে। রোগ নিরাময় কার্যে পারঙ্গম চিকিৎসক হলেন—কুসলো ভিসক্কো সল্লকত্তো। (মিলিন্দ প্রশ্ন পৃ ১১০) কুশলী চিকিৎসক এবং শল্যবিদ। এঁরা কঠিন ব্যাধি—গরুকম ব্যাধিং বলবোসধবলেন লহুকং করোতি। অঙ্গবিদ্যা, ভূতবিদ্যা বা ভূতবৈদ্যের মন্ত্র, অহিবিদ্যা (অহি গুণধিক বা Snake-Charmer বা সর্প চিকিৎসক), বিচ্ছিকবিদ্যা বৃশ্চিক দংশন চিকিৎসা এবং মুষিক বিদ্যা বা মুষিক দংশন চিকিৎসার উপযোগিতা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। (ব্রহ্মজাল সুত্ত)

রোগ নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক যতক্ষণ সঠিক রোগ নির্ধারণ করতে পারতেন না ততক্ষণ চিকিৎসা আরম্ভ করতেন না। কোনও পঙ্গু ব্যক্তি যখন চিকিৎসার জন্য আসবে তখন চিকিৎসক প্রথমেই তার বয়স জানবেন। (ভিসকস্স পুব্বে ব আয়ুং ওলোকেত্বা আতুরো উপসংকমিতব্বো হোতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ ১৯৪)। অন্য একশ্রেণীর চিকিৎসক আছেন যিনি পৃথিবীর সমস্ত ঔষদের নাম জানেন। তিনি পঙ্গু ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ পান করান। সম্পত্তে কালে গিলানকং ভেসজ্জম পায়েতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন পৃ ৭৪)

চিকিৎসকেরা রোগীর চিকিৎসা ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকতেন। তাঁদের ভাবনা হল—'কী ভাবে, কী ঔষধ প্রয়োগ করে আমি রোগীকে রোগ মুক্ত করব'? এ রূপ চিকিৎসকের

কাছে রোগীও নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করতেন। এমন কি স্ত্রীরোগ যা গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য তাও চিকিৎসকের কাছে রোগী প্রকাশ করতেন। ইত্থি মূঢ়গব্ভা ভিসকস্স অদস্সনীয়ম গুয্হম দস্সেতি। তং সুকতগুণং অনুস্সরন্তো অপরাপরং ভিসক্কম উপসেবতি। যে গর্ভ পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয় ঔষধ প্রয়োগে সেই গর্ভ চিকিৎসক রক্ষা করেন। বিরুদ্ধ গব্বকরণং (ব্রহ্মজালসূত্র)

রোগ নিরাময় পদ্ধতির মধ্যে ছিল অপার অভিনিবেশ ও ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলীর কর্ষণা। চিকিৎসক ও শল্যবিদ অত্যধিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগী রোগ মুক্ত হবে তা প্রয়োগ করতেন। কাকেও পারগেটিভ, কাকেও মলম প্রয়োগ করেন। কাকেও ইনজেকশান দিয়ে দেন। বমনীয়ং বমেতি, বিরেচনীয়ম বিরেচেতি, অনুলেপনীয়ং অনুলিম্পেতি, অনুবাসনীয়ম অনুবাসেতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ ১৬৯) আরো কয়েকটি পদ্ধতি জানা যায়—

১। যে রোগীকে emetic বা purger বা clyster প্রয়োগ করা হবে তাকে সাবধানে দেখতে হবে।

২। purge প্রস্তুতি—চিকিৎসক বা বেজ্জ প্রথমেই তাঁর রোগীকে ৪/৫ দিন তৈল সেবন করাবেন। এতে রোগী শক্তিশালী হবে। দেহ নরম হবে। তারপর কিছু দিন পরে purgative দিতে হবে।

৩। পাঁচ প্রকার মূল দ্বারা চিকিৎসা করা যেতে পারে। মহাবগ্গে কিছু কিছু মূলের বর্ণনা আছে। (Vin. I, pp 206-278)

৪। দোষসমূহ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে স্নেহ জাতীয় ঔষধ প্রদান করা হবে না। যখন দেহ দোষ মুক্ত হয় তখন রোগীর স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য বলকারী ঔষধ প্রয়োগ করেন।

সুত্তনিপাতে (৩১২ নং সুত্ত) এবং মিলিন্দ প্রশ্নে ৯৮ প্রকার রোগ সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। অট্টনবুতি রোগা। মিলিন্দ প্রশ্নে আরো কয়েকটি রোগের নাম পাওয়া যায়।

১। তিন পুপ্পক রোগ বা hay fever, illness due to grass flower.
২। ড়াহ বা পরিলাহ, fever.
৩। বিসুচিকা, Cholera
৪। লোহিতপক্খন্দিকা, Blood-dysentry.

৮টি কারণে দেহে রোগ দেখা দেয়। যেমন—

১। তিন দোষের মিলন, wind, bile and phlegm.
২। আবহাওয়ার বিভিন্নতা (different climate)
৩। পরিবেশের প্রভাব (environment)
৪। বাইরের agency

৫। কর্মফল maturing

বলা হয়েছে যমরাজার তিন দূত—(১) জরা বা বার্ধক্য (২) ব্যাধি, (৩) মৃত্যু।

বায়ু দশ প্রকারে বাধা সৃষ্টি করে— শৈত্য, উষ্ণতা, পিপাসা, অতি ভোজন, বিশ্রাম, উপবাস, দৌড়ান, চেষ্টা, কর্মফল। শৈত্য, উষ্ণতা, অযোগ্য খাদ্য কফকে বাড়ায়। ত্রিদোষ মিলিত হলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়। নৈতিক কারণে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যেরা পশুহত্যা বন্ধ করেছিলেন। শব ব্যবচ্ছেদও বন্ধ হয়ে যায়। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের রুগ্ন ভিক্ষুর সেবাযত্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনিত্য তত্ত্ব ও মানব দেহের শেষ পরিণাম ভাববার জন্য মৃতদেহ না পুড়িয়ে শ্মশানে নিক্ষেপ করতেন। এভাবে শবদেহের ক্রম পরিণতি নিরীক্ষণ করতেন। অনেকগুলি অস্থির নামও পাওয়া যায়। যথা—

হস্তাস্থি
পদাস্থি
উদরাস্থি
কটি অস্থি
পৃষ্ঠকণ্টক
শিরকটাস্থি ইত্যাদি।

ব্রহ্মজাল সুত্তে 'ধোপনং' বা অস্থি ধোয়া শব্দ পাওযা যায়। তখন ভারতের কোনও কোনও জনপদে মৃতদেহ দাহ করা হত না। গর্তে পুতে রাখা হত। তারপর মাংস পচে গলে গেলে গর্ত হতে মৃতদেহ তুলে অস্থি সকল ধুয়ে সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা মেখে রেখে দিত। এর নাম 'ধোপনং'। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষও মানবদেহের অস্থি সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করত।

শল্য দ্বারা ওপারেশান করে রোগীর ক্ষত নিরাময় করা হত। যে শল্য চিকিৎসক তাড়াতাড়ি একটি arrow দ্বারা রোগীকে রোগ মুক্ত করেন তিনি সাহসী চিকিৎসক। boil ইত্যাদি কষ্টদায়ক ক্ষত চিকিৎসায় ঔষধ ও শস্ত্র উভয়ই প্রয়োজন। মেদোগণ্থি বা fatty tumour নিরাময়ের জন্য চিকিৎসক ও শল্যবিদ উভয়কেই প্রয়োজন হত। শল্যবিদ ওপারেশানের পূর্বে তাঁর 'সত্থকং তিখিণম' করেন, তারপর যমক দহন সলাকা বা Caustic sticks আগুনে দগ্ধ করে নেন।

ঔষধের গুণ (অগদস্স গুণা)—অজস্র বার বলেও শেষ করা যায় না। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে বিশেষভাবে তা উল্লিখিত হয়েছে।

১। ঔষধ হল antidote। ইহা দ্বারা যে কোনও প্রকার বিষ ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়—সব্বং বিসং পটিহন্তি, পৃ ৪১৭।

২। antidote সমস্ত রোগের নিরাময় ঘটায়—অগদো রোগানং অন্তকরো। পৃ ৩১৯।

৩। ইহা অমৃত তুল্য—অগদো অমতং। পৃ ৩১৯।

৪। antidote-এ কোনও রোগ জীবাণু থাকে না। অগদে কিমী ন সণ্ঠাহতি। পৃ ৪১৭। গোমুত্রও ঔষধ রূপে গৃহীত হয়েছে।

৫। নেত্র রোগ চিকিৎসার ঔষধ-এর উল্লেখ রয়েছে ব্রহ্মজাল সুত্তে। নেত্রতর্পণ বা নেত্ততপ্পনং তৈল দ্বারা চক্ষু শীতল করা হয়। পরে প্রত্যঞ্জন বা পচ্চঞ্জনং—শীতল ঔষধের অঞ্জন প্রয়োগ করা হত।

শিশু পরিচর্যায়ও প্রাচীন ভারতের গৃহীত কিছু কিছু রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ব্রহ্মজাল সুত্তে। বলা হয়েছে—উচ্ছাদনং বা উৎসাদন—শিশুদের গাত্রগন্ধ বিনাশের জন্য সুগন্ধ চূর্ণ বা powder বিলেপন করা হত। নহাপনং বা স্নান করান হত। পরিমর্দন— তৈলাদির দ্বারা শিশুদের গাত্র মর্দন করা হত।

খাদ্যের গুণ (ভোজনস্স গুণা)—

১। খাদ্য সমস্ত প্রাণীর অবলম্বন (ভোজনং সব্বসত্তানম উপথাম্ভব) এবং জীবনের রক্ষক—(আয়ুধারণং) মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ ২৪৫

২। খাদ্য সমস্ত প্রাণীর বলবর্ধক (সব্বসত্তানং বলবদ্ধনং)।

৩। খাদ্য সৌন্দর্যবর্ধক (বণ্ণজননং)

৪। খাদ্য সমস্ত জীবের কষ্টের লাঘবকারী (দরথবূপসমনং)

৫। খাদ্য ক্ষুধাজনিত দুর্বলতার নিবৃত্তিকারক (জিগচ্ছাদুব্বলয় পটিবিনোদনং)।

৬। সকল প্রাণী খাদ্যের প্রত্যাশী (ভোজনং সব্বসত্তানম অভিপত্থিতং)

৭। খাদ্যের জন্য সকল প্রাণী সুখে থাকে (আহারুপনিসি্সতা সব্বে সত্তা সুখং অনুভবন্তি।)

ব্রহ্মজাল সুত্তে 'আমিস সন্নিধি' (Curry-stuffs) এর উল্লেখ আছে। তিল, তণ্ডুল, মুগ, মাস, নারিকেল, লবণ, মৎস্য, তৈল, ঘৃত এই শ্রেণীভুক্ত।

সিদ্ধার্থের প্রদত্ত সুজাতার পায়সান্ন বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে পায়সান্নের ১০ গুণ। ইহা জীবনী শক্তি, বর্ণ, আনন্দ, গায়ের জোড়, মনের একাগ্রতা, ক্ষুধার ও তৃষ্ণার অবসান, ব্রাডারের পরিষ্কারক এবং হজম শক্তির বৃদ্ধিকারক। (মহাবগ্গ, VI, p. 24)

বলা হয়েছে জীবনদায়ী খাদ্য যদি ঠিকমত গৃহীত না হয় তবে তা জীবন হানির কারণ হয়। অধিক খাদ্য গ্রহণে কলেরা, ডাইরিয়া ইত্যাদি হয়। অতিভোজন বা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে—বিসমং পরিণতি আহার দুট্টতায়। ইহা খাদ্যের দোষে নয়, পাকস্থলীর দোষে। ইহার কারণ বলা হয়েছে (যদ ইদং অগ্নিদুব্বলতা, মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ ২৬৫)

চিকিৎসক

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকের নাম পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় যাঁরা

চিকিৎসা শাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব তুলে ধরেছেন। এঁরা চিকিৎসকদের পূর্বাচার্য ছিলেন (তিকিচ্ছকানং পুব্বকা আচরিয়া)। এঁদের মধ্যে জীবক ছিলেন বৌদ্ধ চিকিৎসা জগতে একটি নক্ষত্র প্রতিভা। বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে তাঁর জীবনী ও কর্মকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি রাজগৃহের রূপজীবা শালবতীর পুত্র। রাজকুমার অভয় তাঁকে আবর্জনা স্তূপ থেকে তুলে রাজভবনে নিয়ে আসেন। তক্ষশীলার বিখ্যাত আচার্যের নিকট তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ৭ বৎসরে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। (চুল্লবগ্গ, v, 14.1) মানবধর্মের উন্মোচনে এবং সর্বোপরি চিকিৎসকোচিৎ অজস্র গুণের সমারোহে তিনি ছিলেন পরম প্রতিভার আগ্নেয়-স্বাক্ষর। তিনি ভগবান বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, মহারাজ বিম্বিসারের রাজবৈদ্য এবং দক্ষ শল্য চিকিৎসক ছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর শল্য চিকিৎসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জীবক তা অতি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। মাথার খুলি বা করোটি ওপারেশান (Cranial surgery) তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। জীবক তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্বেদ ও উদ্ভিদ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও অসামান্য কীর্তি সর্বজন স্বীকৃত। তিনি মহারাজ বিম্বিসার, রাজগৃহ ও বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র', সাকেতের শ্রেষ্ঠীপত্নী এবং অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোত প্রমুখ রাজা মহারাজা ও সম্মানিত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির সাফল্য ও উৎকর্ষ প্রমাণিত করেন। তাঁর উপাধি ছিল কৌমার ভৃত্য (কোমারভচ্চ)। তিনি বুঝেছিলেন পৃথিবীতে এমন কোনও বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও খনিজ পদার্থ নেই যা ভৈষজ্য গুণ বর্জিত। দুঃখের বিষয় এই প্রখ্যাত চিকিৎসকের কোনও গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি উজ্জ্বল কাহিনী পাই।

এই মহান পুরুষ এবং নিষ্ঠাবান চিকিৎসক, আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে আলোড়িত করে।

জীবকের জীবন আখ্যান থেকে তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়— (১) তক্ষশীলা এ সময়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর রাজগৃহ থেকে আরম্ভ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। (২) চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পাঠকাল ছিল ৭ বৎসর। (৩) Practical Examination প্রচলিত ছিল। বৃক্ষায়ুর্বেদ, ঔষধি বৃক্ষ এবং তাদের গুণাগুণ বাস্তব উদাহরণ দ্বারা শিক্ষণীয় ছিল। (৪) Skull, Belly ওপারেশান করা হত। (৫) সাকেত, বেনারস, বেসালি, উজ্জেনী থেকে জীবককে ডাকা হত। (৬) ওপারেশানের সফলতা নির্ভর করত antiseptic medicine-এর ব্যবহারের উপর। জীবকের প্রস্তুত মলম এই গুণসম্পন্ন ছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান ও মানব কল্যাণের সংযোগ ঘটিয়ে তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ

চিকিৎসকের সমুন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চিকিৎসা ও সেবায় আত্মনিবেদিত এই মহান ভিক্ষু-প্রতিম মানুষটির কর্মযোজনার প্রয়াস ও প্রচেষ্টার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল—

শিরোরোগ (Cephalitis) : ৭ বৎসরের পুরাতন রোগী। রোগীনী সাকেতের শ্রেষ্ঠী পত্নী ওষধি—চর্বি এবং বিবিধ ভৈষজ্য। নাসিকায় প্রয়োগ করে মুখ দিয়ে নিঃসরণ।

ভগন্দর (Anal fistula) : মহারাজ বিম্বিসার ছিলেন রোগী। জীবক একবার মাত্র প্রলেপ দিয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করেন।

শিরোরোগ, ৭ বৎসরের পুরাতন। রোগী রাজগৃহের একজন শ্রেষ্ঠী। মস্তকে অস্ত্রোপচার করে নিরাময় করেন।

অন্ত্র রোগ (Intestine diseses) : রোগী বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র। উদরে অস্ত্রোপচার করেন।

পাণ্ডুরোগ (Jaundice) : রোগী উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত। চর্বি জাতীয় ভৈষজ্য দিয়ে নিরাময় করেন।

পিত্তাধিক্য (Bilious trouble) : রোগী ভগবান বুদ্ধ। উৎপলের ভৈষজ্য তিনবার ঘ্রাণ করিয়ে দেন। ভগবান ঘ্রাণ নিয়ে ৩০ বার বিরেচন করে আরোগ্য লাভ করেন।

রক্তপাত (Haemorrhage) : দেবদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরে ভগবানের পদ হতে রক্তপাত হলে তাঁকে প্রলেপ দিয়ে নিরাময় করেন।

এছাড়া ভিক্ষুদের পাঁচ প্রকার রোগ যথা—কুষ্ঠ, গণ্ড, চর্মরোগ, ক্ষয়রোগ, অপস্মার ব্যাধির চিকিৎসা করেন। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রাচীন বৈদ্যের নাম পাওয়া যায়। বলা হয়েছে এঁরা চিকিৎসকদের পূর্বাচার্য ছিলেন। (চিকিচ্ছকানং পুব্বকা আচরিয়া) এঁরা হলেন—

১। নারদ
২। ধম্মন্তরি
৩। কপিল
৪। কণ্ডরগ্গিস্‌সাম
৫। অতুল
৬। পুব্ব কচ্চায়ন

এঁরা যাবতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন রোগের উৎপত্তি রোগের উৎস, প্রকৃতি, চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৃতকার্য হওয়া বা অকৃতকার্য হওয়া (সিদ্ধা-সিদ্ধং) জানতেন। এরূপ দেহে এরূপ রোগ উৎপন্ন হয় এও তাঁরা বুঝতেন।

উদ্ধৃত চিকিৎসকদের সম্বন্ধে কম তথ্যই পাওয়া যায়।

নারদ— দেবর্ষি। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর নাম পাওয়া যায়। ধম্মন্তরি—জাতক ৪র্থ খণ্ড,

পৃ ৪৯৬, ৪৯৮। ধন্বন্তরির সঙ্গে আরো দুজন ডাক্তারের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন বেতরণী ও ভোজ। এঁরা সর্পাঘাতের নিরাময় চিকিৎসক। আরো একজন ধন্বন্তরির নাম পাওয়া যায়। তিনি হলেন— কাশ্যপ ধন্বন্তরি। মহাভারতের আদি পর্বেও তাঁর নাম পাওয়া যায়।

অঙ্গীরস—অথর্ব বেদেও এঁর নাম পাওয়া যায়। Charms-এ পারদর্শী।

কপিল—বা কপিলবন প্রাচীন চিকিৎসক। ভাগভট—তাঁর অষ্টাঙ্গ সংগ্রহে এঁর নাম করেছেন।

আরো একজন দক্ষ চিকিৎসকের নাম জাতকে পাওয়া যায়। তিনি হলেন সীবক। অস্ত্র ব্যতীত কেবল নীল পদ্মের উপর কিছু চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে তিনি রাজা শিবির চক্ষুরুৎপাটন করেন। (জাতক vol. iv) জাতকে একজন পারিবারিক চিকিৎসকের নামও পাওয়া যায়। ইনি সর্পাঘাত চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। (জাতক, vol. I) একজন ব্রাহ্মণ চিকিৎসক ছিলেন যিনি আমশায় (Dysentery) রোগে অভিজ্ঞ ছিলেন। একজন বোধিসত্ত্ব ও তক্ষশীলায় চিকিৎসা শাস্ত্র সহ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে নিজ গৃহ বেনারসে প্রত্যাবর্তন করেন। (জাতক, vol. iv) শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষককে বেতন দান প্রথা প্রচলিত ছিল। বলা হয়েছে—আচরিয়ং ধনেন বা বত্তপটিপত্তিয়া বা আরাধেত্বা। প্রচলিত ফি বা আচার্যকে দৈহিক কাজের দ্বারা বেতন পরিশোধ করতে হত।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রের নব নির্মাতা। তিনি বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্যমধ্যে ঔষধের বৃহদায়তন Store-room নির্মাণ করেন। স্থানে-স্থানে ওষধি বৃক্ষ রোপন করেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের (খ্রী পূ তৃতীয় শতক) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফলে সমগ্র দেশ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। ভারত নূতন উদ্দীপনার প্রাণমন্ত্রে নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করল। তিনি যুদ্ধ ও পশু শিকার বন্ধ করে দেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও নূতন আলোকপাত হল। তাঁর বিপুল সাম্রাজ্যে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম এবং ফলের গাছ রোপণের ব্যবস্থা করেন। A. Das, The Tree Thrones of the Buddhas, pp. 23-24.

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ চিকিৎসকদের মধ্যে বাগভট্, নাগার্জুন, চক্রপাণি, সিদ্ধ নাগার্জুন, বৃন্দমাধবকর এবং ভাবমিশ্র দৃঢ় পদক্ষেপে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে তার ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। চরক ও সুশ্রুত সংহিতার পরই নাম করতে হয় বাগভট্-এর 'অষ্টাঙ্গ' হৃদয়, (heart or the Kernel of the eight limbs or divisions of medicine) মহাগ্রন্থের। এই গ্রন্থে তিনি চরক ও সুশ্রুত সংহিতার reconciliation করেছেন। চরক, সুশ্রুত ও ভিক্ষু বাগভট্কে বলা হয়েছে 'বৃদ্ধ-ত্রয়ী' (Triad of Ancients)।

প্রারম্ভেই বাগভট্ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ প্রতীকের নাম করেছেন। গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

অভিধাতৃবশাৎ কিংবা দ্রব্যশক্তির্বিশিষ্যতে।
অতো মৎসরমুৎসৃজ্য মাৎসর্য্যমবলম্ব্যতাম।।

ঋষি প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্তা চরক-সুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদগহ্যং সুভাষিতম্।।
হৃদয়মিব হৃদয়মেতৎ সর্ব্বায়ুর্ব্বেদবাঙ্ময়পয়োধঃ।
দৃষ্টা যচ্ছুভবাপ্তং শুভমস্তু পরং ততো জগতঃ।।

(শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত 'প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ' গ্রন্থ হতে গৃহীত, পৃ. ৪০)

দ্রব্যশক্তি দৈবানুগ্রহ হতে বড়। মাৎসর্য ও বৈরীভাব বর্জন করে মধ্যস্থ ভাব গ্রহণীয়। ঋষি প্রণীত বলে যদি চরক-সুশ্রুত বর্জনীয় হয় তবে ভেড়সংহিতাদি পাঠ করা হয় কেন? সুভাষিত শাস্ত্র প্রমাণ গ্রাহ্য। 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' সর্বায়ুর্বেদের হৃদয় এবং বাঙ্ময় পয়োধিস্বরূপ। এই গ্রন্থে যে শুভফল পাওয়া যাবে তা বিশ্বের সকলের শুভকর হোক।

খুব সম্ভবতঃ বাগভট্ নবম শতাব্দীতে (800-850 A.D) আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন তিনি সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ডি. সি. ভট্টাচার্য তথ্য দ্বারা প্রমাণিত করেছেন তিনি আরো পরবর্তীকালের মানুষ ছিলেন। সিন্ধু তাঁর জন্মস্থান। তাঁর 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' গ্রন্থ আট ভাগে বিভক্ত। যেমন—

১। শল্য চিকিৎসা।
২। শালক্য—চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, প্রভৃতি স্থানের রোগ বর্ণনা ও চিকিৎসা।
৩। কায় চিকিৎসা—জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, সোথ, উন্মাদ, কুষ্ঠ, মেহ রোগের চিকিৎসা।
৪। ভূতবিদ্যা— দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, পিশাচ ইত্যাদির শান্তি কর্ম।
৫। কৌমার বিদ্যা—শিশু পালন, ধাত্রী বিদ্যা, বাল রোগ চিকিৎসা প্রণালী।
৬। অগদ তন্ত্র—সর্প, কীট, বৃশ্চিক দংশন জনিত রোগের চিকিৎসা।
৭। রসায়ন তন্ত্র—আয়ু ও মেধা বৃদ্ধির চিকিৎসা।
৮। বাজীকরণ—শুক্রের শোধন ও বর্ধনের উপায় নির্ধারণ।

বাগভটের বিখ্যাত রচনাবলী—

1. A compendium of Hindu System of Medicine, composed by Vagbhatta, with commentary of Arundatta, Revised and collected by Anna M. Kunte, 2 vols., Bombay, 1880.
2. Astangahrdaysamhita, Vagbhata's : ein altindiches Lehnbuch der Heilkunde, ans dem Sanskrit ins Deutche ubertragen, mit Einleitung, Anmerkungen und Indices von Luise Hilgenberg und Willibald Kirfel, Leiden, 1937-1940.
3. Ashtanga Sangraha of Vagbhatta : (In Sanskrit), with the commentary by Indu, edited by T. Rudraprasava, 3 vols. Trichun, 1913-24.

বাগভট্-এর গ্রন্থসমূহে মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ধাতু শোধন, মারণ প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ নেই। লবণ, যবক্ষার, খনিজ ধাতু পরীক্ষার প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে।

বোধিসত্ত্ব নাগার্জুনের অভিজ্ঞতায় ও চিন্তায় প্রাচীন ভারতের অসাধারণ গবেষণা ও অগ্রগতির দক্ষতা বিধৃত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক, রসায়নবিদ (alchemist) এবং মাধ্যমিক দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবন কর্তা। সুশ্রুত সংহিতা তিনি revised করেন। খ্রী পূ দ্বিতীয় শতকে তাঁর আবির্ভাব। কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন নাগার্জুন হর্ষের সমসাময়িক। আবার কারো কারো মতে তিনি কণিষ্কের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারনাথ তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে নাগার্জুনের চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে বলেছেন। অনুমান করা যায় তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বিদর্ভের অন্তর্গত মহাকোশলে তাঁর জন্ম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভাধর আচার্য। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক এই অসাধারণ মণীষী চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর অমল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তির্যক, পাতক প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ মারণ তাঁর আবিষ্কার।

নাগার্জুনের রচিত গ্রন্থাবলী।

১। মাধ্যমিক সূত্র
২। নাগার্জুন তন্ত্র
৩। নাগার্জুনীয় ধর্মশাস্ত্র
৪। যোগরত্নাবলী
৫। কৌতুহল চিন্তামণি
৬। পক্ষপুট
৭। রসরত্নাকর
৮। আরোগ্য মঞ্জরী
৯। রসেন্দ্রমঙ্গল ইত্যাদি।

হিউয়েন সাঙ বলেছেন, বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশ্রুত সংহিতার প্রারম্ভিক সম্পাদক (redactor of original Sushruta Samhita) এই নব্য রসায়নের জন্মদাতা দীর্ঘকাল কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীপর্বতের এক গুহায় তপস্যা করেছিলেন বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন।

আরো পরবর্তীকালে ছোট বাগভট্ (অষ্টম শতাব্দী) 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা' রচনা করেন। তিনি ছিলেন ভিক্ষু বাগভট্-এর শিষ্য। 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা' সুমধুর ছন্দে রচিত সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চিকিৎসা শাস্ত্র। সুশ্রুত থেকে তিনি যথাসাধ্য গ্রহণ করেছেন। (The Science of Medical and Physiological Concept in Ancient and

Medieval India, ed. N.H. Keswani, p 18). শল্য চিকিৎসাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫০০-১২০০ শতক পর্যন্ত প্রায় প্রাচীন ঐতিহ্য ধারাকে অনুসরণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। এ সময়ের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন মাধবাচার্য (৮ম শতাব্দী)। তাঁর নিদানে রোগতত্ত্ব (Pathology) বিষয়ে পূর্বসূরীদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থ তাঁর পূর্বসূরী 'বৃদ্ধ ত্রয়ীর' সমকক্ষতায় উন্নীত হয়েছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনুরাগীদের মধ্যে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল। বলা হত—

মাধবাচার্য রোগতত্ত্ব (Pathology),
ভাগবট্ মৌলিক নিয়ম (Principles),
সুশ্রুত ওপারেশান বা শল্য চিকিৎসা (Surgery),
চরক চিকিৎসা (Therapy) (Ibid, p. 19) বিদ্যায় অসাধারণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন।

মাধব বা মাধবকরের পিতার নাম ইন্দুকর। তিনি রোগের গণনা এবং বর্ণনা (enumeration এবং description) ৭৯টি অধ্যায়ে তালিকাকরণ করেন। রোগের কারণ, রোগ লক্ষণ এবং জটিলতার বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেন। মসুরিকা (Smallpox) বিষয়েও একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত করেন। এই রোগকে তাঁর পূর্ববর্তীরা minor disease রূপে বর্ণনা করেছেন। দীর্ঘ দিন মাধবের নিদান পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

মাধবের পর আয়ুর্বেদের প্রাণধারা স্তিমিত হয়ে আসে। ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকার বহন করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আবার আয়ুর্বেদকে লোকপ্রিয় করে তোলেন। তিনি কাশীতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং চর্চা করেন। তাঁর পরবর্তী আয়ুর্বেদাচার্য তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—"a jewel of a physician and master of the Text." (Ibid, p. 22)।

ভাবমিশ্র তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত আয়ুর্বেদাচার্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতি তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

এই বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ভাবপ্রকাশ'। ভাবপ্রকাশের রচনাকাল ১৫৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থেই প্রথম Syphilies বা ফিরিঙ্গ রোগ যা পর্তুগীজরা এদেশে বহন করে নিয়ে আসে তার উল্লেখ আছে। এই রোগের বিভিন্ন অবস্থা এবং চিকিৎসা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মিশনারীরা ভারতে ও বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বাণী বহন করে নিয়ে যেতেন। এঁরা হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ঔষধ ইত্যাদিও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঔষধ, বৃক্ষ-লতা-গুল্মও দেশ থেকে দেশান্তরে যেত। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে আয়ুর্বেদও সেই দেশ সমূহে প্রচারিত হয় এবং বিশেষ স্থান পায়। সুতরাং প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সিংহল, চীন, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, বলি, জাপান প্রভৃতি দেশে মর্যাদা সহকারে গৃহীত হয়।

কেবল মানুষের চিকিৎসাই নয়, পশু চিকিৎসায়ও ভারত অগ্রণী ছিল। অশ্ববিদ্যা, অশ্বচিকিৎসা এবং গজবিদ্যা ও গজ চিকিৎসায় ভারতের অগ্রগতি বিস্ময়কর। সম্রাট অশোকের সময়ে শালিহোত্র ছিলেন বিখ্যাত অশ্ববৈদ্য। পালকাপ্য মুনির 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' ও 'গজশাস্ত্রম', নীলকণ্ঠের 'মাতঙ্গলীলা' পশুজগতের কল্যাণবোধে রচিত গ্রন্থ। বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতের বিশেষ অবদান। শ্রদ্ধার সঙ্গে তা পঠিত ও আলোচিত হত। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তিনি তাঁর রাজ্যের স্থানে স্থানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়, ভৈষজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পশু চিকিৎসার জন্যও স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

তাঁর অনুশাসন থেকে জানা যায় তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র এবং চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তাম্রপর্ণি এবং গ্রীকরাজ আন্টিওকাসের রাজ্যেও চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত করেন। দ্বিবিধ পদ্ধতি হল (১) মানুষের জন্য চিকিৎসা (২) পশুদিগের জন্য চিকিৎসা। রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপথে তিনি মানুষ ও পশুদিগের জন্য কূপ খনন ও বৃক্ষাদি রোপণ করেন।

বৃক্ষায়ুর্বেদকে মনীষী বাৎসায়ণ তাঁর 'কামসূত্র'-এ ৬৪ শিল্পের অন্তর্গত করেছেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিতে বৃক্ষায়ুর্বেদের উল্লেখ আছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় বৃক্ষায়ুর্বেদ সম্পর্কে ৩০টি শ্লোক আছে। 'উপবন বিনোদন'-এ বৃক্ষকে প্রকৃতির অনিবার্য দান বলেছেন। আমাদের প্রাচীন চিন্তাবিদগণ বৃক্ষের নানা ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন বৃক্ষও বাত, পিত্ত, কফে আক্রান্ত হয়। এর চিকিৎসা পদ্ধতিও তাঁরা বলেছেন। (The Tree Thrones of the Buddhas, pp. 20-26) লতা-গুল্মের শব্দকোষ বা Encyclopaedia হল Nighantu। প্রাচীন ভারতে অনেক নিঘণ্টু রচিত রয়েছে। ধন্বন্তরির নিঘণ্টু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভাবপ্রকাশের নিঘণ্টু আর একটি বিশেষ সংযোজন। এই গ্রন্থে বৃক্ষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে এক হাজার ঔষধের নাম পাওয়া যায়।

মৃত্যু, অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু অলঙ্ঘ্যনীয়। চিকিৎসকেরা মৃত্যুর ৪টি কারণ নির্ধারণ করেছেন। যেমন—

১। আয়ুক্ষয়

২। কর্মক্ষয়

৩। আয়ু-কর্ম উভয় ক্ষয়

৪। উপচ্ছেদক মৃত্যু

আয়ু ও কর্ম উভয় শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনও বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে মৃত্যু হলে তাকে উপচ্ছেদক কর্ম মৃত্যু বলা হয়েছে। আট প্রকারের উপচ্ছেদক মৃত্যু আছে—

১। বাত, ২। পিত্ত, ৩। শ্লেষা জনিত ব্যাধি ৪। সন্নিপাত ৫। বহিঃপ্রকৃতি হতে উৎপন্ন বিপত্তি। যেমন ভূমিকম্প, বজ্র, ঝড়, বৃষ্টি, যানভঙ্গ প্রভৃতি। ৬। বিপরীত ভাবে ব্যবহৃত

দ্রব্যাদি ৭। আকস্মিক আক্রমণ, ৮। কর্ম বিপাক বা উৎপীড়ক ও অপঘাত কর্ম প্রভাবে উৎপন্ন ব্যাধি।

ইউথেনোসিয়া বা চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাহীন স্বেচ্ছামৃত্যু।

এই তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম স্বীকৃত নয়। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি পঞ্চশীলের অন্তর্গত একটি শীল হল 'পাণাতিপাতা বেরমণী'—প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকবে। আচার্য চিকিৎসকগণ রোগোৎপত্তি, রোগের নিদান, রোগের প্রকৃতি, রোগোপশম, চিকিৎসা, ঔষধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সাফল্য-অসাফল্য নিয়েই চিন্তা করেছেন। মৃত্যু নয় জীবনকেই মেনে নেবার নিঃশব্দ অথচ প্রত্যয়ী ঘোষণাই তাঁদের কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছে।

মুহূর্তের পর মুহূর্তে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। যা মাতৃগর্ভে প্রথম প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান স্পন্দনের সহিত কললরূপে আরম্ভ হয়েছিল স্বকার্য সম্পন্ন করে যথাসময়ে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে নিত্য পরিবর্তনশীল সংসার স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সুস্থ, সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখার পদ্ধতিও বলা হয়েছে।

মানব সভ্যতার যা কিছু উৎকৃষ্ট উপাদান, উজ্জ্বল আবিষ্কার ও উত্তরাধিকার ভারতীয় মনীষীদের ধ্যানে, জ্ঞানে, মননে এবং কর্মে তা অনুবর্ণিত। বিশ্বমানবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বার্তাবাহীরূপে তা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেছে। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যার মধ্যেও বিধৃত হয়ে আছে বিশ্বমৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পরিচয়। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ইহা সম্প্রসারিত হয়েছে প্রাণদানকারী বর্ষাধারার মত।

ধন্বন্তরী সমুদ্রতল হতে অমৃত-কলস হাতে নিয়ে উঠে এসেছিলেন। বিশ্বের সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে নিরাময় ও অনন্ত আয়ুদান করা ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর সাধনার ফল তিনি সকলকে দান করে গেছেন। অনন্ত আয়ু উদ্বোধনের যে বিদ্যা তাই আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর্বেদ সকল মানুষের কল্যাণের জন্য ভারত নিঃশব্দে দান করে গেছে।

ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"Art, Science and Religion are but three ways of expressing a single truth." আর এই সত্য হল বিশ্বমৈত্রী এবং সর্বমানবের সর্বাত্মক দুঃখ-বেদনা দূরীকরণের জন্য সুশৃঙ্খল কর্মযোজনা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। N.H. Keswani, The Science of Medicine and Physiological Concept in Ancient and Medieval India, All-India Institute of Medical Science, New Delhi, 1974.

২। A. Das, The Three Thrones of the Buddhas, Balaram Prakashni, 2003.

৩। Astangahrdayasamhita, Vagbhatta : A Compendium of the Hindu System of Medicine, with the Commentary of Arundatta, 2 vols., Bombay, 1880.
৪। Bhava Prakasha of Sri Bhava Mishra (In Hindi) ed. Sree Brahma Shankara Mishra, Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi, 1961.
৫। Bower Manascript, ed. A.F.R. Hoernle, New Imperial Series, vol 22, Calcutta, 1893-1912.
৬। Madhava Nidana of Madhava Kara (In Hindi) ed. Sree Brahma Shankar Shastri, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras, 1954.
৭। Mahavagga : Tr., T.W. Rhys Davids & H. Oldenberg vol. xiii & xvii, ed. Max Muller, Oxford, 1881.
৮। Banerjee, D.N., Ayurveda Sharira, Vol I, Industry Publishers, Calcutta, 1951.
৯। Charaka Samhita, P. Roy & H. N. Gupta, New Delhi, 1965.
১০। Sushruta Samhita, Tr. & Ed. Kabiraj Kunjalal Bhishagratna, 3 vols, Varanasi, 1963.
১১। Sreedhar Chandra Barua, Pracin Bharatiya Baudha Vidyapith, 1934.
১২। Brahmajala Sutta, Digha Nikaya, Vol. I, ed. T.W. Rhys Davids & J.E. Carpenter, P.T.S. Oxford, 1983.
১৩। বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, ডঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫।
১৪।প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।
১৫। আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার প্রেক্ষিতে ফলিত বৌদ্ধধর্ম, ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম, ২০০৯।
১৬। Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Vol., 1989. Calcutta Baudha Dharmankur Sabha, p 111, 1989.
১৭। ভেসজ্জ মঞ্জুসা, (১-১৮), জিনদাস লিয়নরত্নে সম্পাদিত, অক্সফোর্ড, দি পালি টেক্স্ট সোসাইটি, ১৯৯৬।
১৮। G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, Colombo, M.D. Grunasena & Co. Ltd, 1958.